

ইসলাম ও নেতৃত্ব শিক্ষা

সপ্তম শ্রেণি



মসজিদে নামিরা



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকগুলো নির্ধারিত

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা সপ্তম শ্রেণি

রচনা

মুহাম্মদ আবদুল মালেক

ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ

ড. মোহাম্মদ ইউসুফ

মুহাম্মদ ইউসুফ আলী শেখ

ইকবাল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম শরীফ

সম্পাদনা

ডক্টর মো. আখতারুজ্জামান

মুহাম্মদ তরীয়ুদ্দীন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১২
পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৪
পুনর্মুদ্রণ : , ২০১৭

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষার যোগ্য করে তোলা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তক। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিরোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমর্যাদাবোধ জাহ্নত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

রাপকল্প ২০২১ বর্তমান সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকারকে সামনে রেখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করার প্রত্যয় ঘোষণা করে ২০০৯ সালে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। তাঁরই নির্দেশনা মোতাবেক ২০১০ সাল থেকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ শুরু করেছে।

ইসলাম মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সকল ক্ষেত্রে গুরুত্ব প্রদান করে। তাই ধর্ম শিক্ষাকে বাস্তব জীবন সংশ্লিষ্ট নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ, অধিকতর ব্যবহার উপযোগী এবং নিজ ধর্ম সম্পর্কে পরিচিতি প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন ঘটিয়ে ইতিবাচক আচরণিক পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে ‘ইসলাম শিক্ষা’ বিষয়টিকে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকে ‘ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা’ নামে অভিহিত করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা যাতে পরিবার, সমাজ, জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকলের প্রতি সহানুভূতিশীল, দেশপ্রেমে উজ্জীবিত, সৎ, ন্যায়নিষ্ঠ, সহনশীল, উদার, শ্রমের মর্যাদাবোধ ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধসম্পন্ন এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বৃদ্ধ হয় সেইসব দিক বিবেচনায় রেখে পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এই পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ অর্জন এবং ক্ষতিকর ও অসদাচরণমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত না হয়ে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠার সুযোগ পাবে।

বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন, নমুনা প্রশান্তি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	অধ্যায়ের শিরোনাম	পৃষ্ঠা নম্বর
প্রথম	আকাইদ	১-২৪
দ্বিতীয়	ইবাদত	২৫-৫০
তৃতীয়	কুরআন ও হাদিস শিক্ষা	৫১-৮২
চতুর্থ	আখলাক	৮৩-১০৩
পঞ্চম	আদর্শ জীবনচরিত	১০৪-১১৯

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

প্রথম অধ্যায়
আকাইদ (آکاہید)

আকাইদ শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হলো আকিদাহ। আকিদাহ অর্থ বিশ্বাস। আর আকাইদ শব্দের অর্থ বিশ্বাসমালা। ইসলামের সর্বপ্রথম বিষয় হলো আকাইদ। ইসলামের মূল বিষয়গুলোর উপর মনে প্রাণে বিশ্বাস করাকেই আকাইদ বলা হয়। আকাইদের সবগুলো বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করলে মানুষ ইসলামে প্রবেশ করতে পারে। অর্থাৎ তাওহিদ, রিসালাত, আখিরাত, আসমানি কিতাব, ফেরেশতা ইত্যাদির উপর বিশ্বাস স্থাপন করার নাম আকাইদ। যে এসব বিষয়ে বিশ্বাস করে, সে-ই ইসলামের প্রবেশকারী বা মুসলিম।

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- তাওহিদের স্বরূপ, গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- কুফরের পরিচয়, কুফল ও পরিগতি বর্ণনা করতে পারব।
- শিরকের পরিচয়, কুফল ও পরিগতি বর্ণনা করতে পারব।
- বাস্তব জীবনে কুফর ও শিরক পরিহার করার উপায়সমূহ বলতে পারব।
- ইমান মুফাস্সাল (ইমানের বিস্তারিত পরিচয়) অর্থসহ শুন্দভাবে পড়তে, বলতে এবং এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আল্লাহর কয়েকটি গুণবাচক নাম ও এসবের অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আল্লাহর গুণবাচক নাম সম্পর্কিত গুণসমূহ নিজ আচরণে প্রতিফলনের উপায় বর্ণনা করতে পারব।
- রিসালাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারব।
- ওহির পরিচয় ও এর উপর বিশ্বাস স্থাপনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব এবং সিরাত ও মিয়ানের পরিচয় বর্ণনা করতে পারব।
- আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে নেতৃত্ব জীবনযাপনের উপায় বলতে পারব।
- নেতৃত্ব জীবনযাপনে তাওহিদের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব।

পাঠ ১

তাওহিদ (الْتَّوْهِيدُ)

তাওহিদ শব্দের অর্থ একত্ববাদ। মহান আল্লাহকে এক ও অদ্বিতীয় সত্তা হিসেবে বিশ্বাস করার নামই হলো তাওহিদ। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা এক। তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ। তিনিই আমাদের রক্ষক, সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও রিযিকদাতা। তিনি অনাদি ও অনন্ত। তাঁর সমকক্ষ বা সমতুল্য কিছুই নেই। তিনিই একমাত্র মাবুদ। সকল প্রশংসা ও ইবাদত একমাত্র তাঁরই প্রাপ্য। মনে প্রাণে এরূপ বিশ্বাসকেই তাওহিদ বলা হয়।

তাওহিদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

আকাইদের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান বিষয় হলো তাওহিদ। তাওহিদে বিশ্বাসের মাধ্যমেই মানুষ ইমান ও ইসলামে প্রবেশ করে। তাওহিদে বা একত্ববাদে বিশ্বাসের পর আকাইদের অন্যান্য বিষয় বিশ্বাস করতে হয়। তাওহিদে বিশ্বাস মানুষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মানবজাতির হিদায়াতের জন্য দুনিয়াতে অনেক নবি-রাসূল আগমন করেছেন। তাঁরা সকলেই তাওহিদের দিকে মানুষকে আহ্বান করেছেন। তাঁদের সকলের দাওয়াতের মূল বাণী ছিল 'লা-ইলাহা ইল্লাহু' ۴۱۴۲۴۳ অর্থাৎ 'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ বা মাবুদ নেই'। এমন কোনো নবি ছিলেন না যিনি তাওহিদের কথা বলেন নি। বরং সকল নবি-রাসূলই তাওহিদের শিক্ষা প্রচার করেছেন। ইসলামের সকল বিধি-বিধান তাওহিদের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাওহিদের পরিপন্থী কোনো বিধান ইসলামে নেই। সালাত, যাকাত, সাওম, হজ- সকল ইবাদতই এক আল্লাহর জন্য করতে হয়। কোনো কিছু চাইতে হলেও এক আল্লাহর নিকট চাইতে হয়। এটাই ইসলামের শিক্ষা। অতএব, ইসলামে তাওহিদের গুরুত্ব অপরিসীম।

তাওহিদে বিশ্বাস মানুষকে দুনিয়াতে ও আখিরাতে সফলতা এনে দেয়। কেননা তাওহিদ মানুষকে আল্লাহর পরিচয় দান করে। মানুষ আল্লাহ তায়ালার ক্ষমতা ও গুণাবলি জানতে পারে। দুনিয়ার কাজকর্মের জন্য মানুষকে পরকালে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে - এ শিক্ষা তাওহিদের মাধ্যমেই লাভ করা যায়। এ শিক্ষার দ্বারা মানুষ অন্যায় কাজ হতে বিরত থাকলে এর ফলে সে আখিরাতে সফলতা লাভ করবে। দুনিয়ার জীবনেও তাওহিদে বিশ্বাসের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। তাওহিদে বিশ্বাসীগণ শুধু আল্লাহ তায়ালার সামনে মাথা নত করে। অন্য কারো সামনে সে মাথা নত করে না। পক্ষান্তরে, তাওহিদে বিশ্বাস না করলে মানুষ বিপথগামী হয়ে যায়। সে গাছপালা, পশু-পাখি, চন্দ-সূর্য ইত্যাদির নিকট মাথা নত করে। নানা মূর্তির পূজা করতে থাকে। ফলে মানুষের আত্মর্যাদা বিনষ্ট হয়। তাওহিদে বিশ্বাস মানুষের মধ্যে আত্মসম্মান ও আত্মসচেতনতা জাগিয়ে তোলে।

তাওহিদ বা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস মানুষকে এক জাতিত্ব বোধ এনে দেয়। ফলে মানুষ পরম্পর ভাত্ত ও সহমর্মিতায় উদ্বৃক্ষ হয়। পক্ষান্তরে, শিরক বা বহু উপাস্যের বিশ্বাস মানুষকে বহুদল ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত করে দেয়। এক মানবজাতির বিভাজন পরিণতিতে পারম্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও হানাহানির কারণ হয়। এতে শাস্তি ও মানবতা বিপর্যস্ত হয়। তাওহিদে বিশ্বাস মানুষকে এক আল্লাহ তায়ালার প্রতি নির্ভরশীল করে। ফলে বিপদে-

আপদে, দুঃখ-কফ্টে মানুষ হতাশ বা নিরাশ হয় না বরং আল্লাহর উপর ভরসা রেখে পূর্ণেন্দ্যমে কাজ করতে থাকে এবং সাফল্য লাভ করে। এভাবে তাওহিদে বিশ্বাস মানুষকে দুনিয়ার জীবনে সুখ-শান্তি ও সফলতার দুয়ার খুলে দেয়।

কতো বিশাল এ বিশুজগৎ। আমাদের পৃথিবী এর সামান্য অংশমাত্র। বড় বড় গ্রহ, নক্ষত্র, ছায়াপথ, নীহারিকা, গ্যালাক্সি এ বিশুজগতে বিরাজমান। এগুলোর প্রত্যেকটিই সুশৃঙ্খলভাবে ঘূরছে। কোনোটি এর নির্ধারিত নিয়মের বাইরে যাচ্ছে না।

কে দিলেন এই নিয়ম? আমাদের পৃথিবী কতো সুন্দর। এতে রয়েছে বিশাল আকাশ, বিস্তৃত মাঠ, বড় বড় পাহাড়-পর্বত, প্রবহমান নদী-নালা, সাগর-মহাসাগর। এ সবকিছুই আপনা আপনি সৃষ্টি হয় নি। কে এসবের সৃষ্টিকর্তা?



প্রাকৃতিক দৃশ্য

ফল খেতে আমরা সবাই ভালোবাসি। আমগাছে আম হয়, জামগাছে জাম। আমরা কি কখনো কঁঠাল গাছে আম কিংবা তরমুজ ধরতে দেখেছি? কেউই দেখিনি। কারণ কঁঠালগাছে কঁঠাল ছাড়া আর অন্য কোনো ফল হয় না। আমাদের চারপাশে রয়েছে নানারকম পশু-পাখি। কাক আমাদের অতিপরিচিত পাখি। কাক সবসময় কা কা করেই ডাকে। কাক কোনো দিন কোকিলের মতো ডাকে না। আবার গরু, ছাগল, কুকুর, বিড়াল সবাই নিজ নিজ স্বরেই ডাকাডাকি করে। আমরা কি কখনো চিন্তা করেছি কেন এমন হয়? কেন এক পশু আরেক পশুর স্বরে ডাকে না? গাছের ফল-ফসল, পশু-পাখির আচার-ব্যবহার- এসব কে নিয়ন্ত্রণ করেন?

বস্তুত আল্লাহ তায়ালাই এই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা ও নিয়ন্ত্রণ। মহাজগতের নিয়ম-শৃঙ্খলা তাঁরই দান। পৃথিবীর সকল কিছুর সৃষ্টাও তিনিই। আর পশু-পাখি, গাছপালাসহ সবকিছুর নিয়ন্ত্রকও তিনি। তিনিই সবকিছু করেন। বরং তিনি যা ইচ্ছা করেন তা-ই হয়। এসব কিছুতে যদি একের বেশি নিয়ন্ত্রণ থাকত, তবে নানারকম বিশৃঙ্খলা দেখা দিত। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন-

لَوْ كَانَ فِيْهَا إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ج

অর্থ : ‘যদি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে, আল্লাহ ব্যতীত বহু ইলাহ থাকত, তবে উভয়েই ধৰ্ষণ হয়ে যেত।’
(সূরা আল-আঞ্চিয়া, আয়াত ২২)

একটু চিন্তা করলেই আমরা বিষয়টি বুঝতে পারব। যেমন মহাজগতের সৃষ্টিকর্তা ও বিধানদাতা যদি একাধিক হতেন, তাহলে মহাজগৎ এত সুশৃঙ্খলভাবে চলত না। একজন স্বৃষ্টি চাইতেন সূর্য পূর্ব দিকে উঠুক। আরেকজন চাইতেন পশ্চিম দিকে। আবার অন্যজন দক্ষিণ বা উত্তর দিকে সূর্যকে উদিত করতে চাইতেন। ফলে এক চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিত।

এমনিভাবে আমগাছে আম না হয়ে কোনো কোনো সময় কাঁঠাল, জাম ইত্যাদিও হতে পারত। এতে আমরা বেশ অসুবিধায় পড়তাম। বস্তুত একাধিক স্বৃষ্টি বা নিয়ন্ত্রক থাকলে বিশৃঙ্খলগতের সুন্দর সুশৃঙ্খল অবস্থা বিনষ্ট হয়ে যেত। আল-কুরআনের অন্য এক আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন-

وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٌ إِذَا لَهُ أَنْ يَخْلُقَ وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ط

অর্থ :“আর তাঁর (আল্লাহর) সাথে কোনো ইলাহ নেই। যদি তা থাকত, তবে প্রত্যেক ইলাহ নিজ নিজ সৃষ্টিকে নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং একে অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করত।” (সূরা আল-মু’মিনুন, আয়াত ৯১)

এ আয়াতেও তাওহিদ বা একত্রবাদের তাৎপর্য সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। নিচের উদাহরণের মাধ্যমে আমরা তা বুঝতে পারি। একাধিক স্বৃষ্টি থাকলে তারা তাঁদের সৃষ্টিকে নিয়ে আলাদা হয়ে যেতেন। যেমন আগনের স্বৃষ্টি আগন নিয়ে পৃথক হয়ে পড়তেন। অতঃপর সমস্ত কিছুকে আগন দ্বারা জ্বালিয়ে দিয়ে তার নিজ ক্ষমতার প্রকাশ করতেন। তেমনি মহাসাগরের স্বৃষ্টি সারা পৃথিবী তার সৃষ্টি দ্বারা দ্রুবিয়ে দিতে চাইতেন। এভাবে স্বৃষ্টাগণ নিজ নিজ সৃষ্টি দ্বারা অন্যের উপর বিজয়ী হতে চাইতেন। ফলে আমাদের অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়ে যেত। পৃথিবীর সকল কিছুই ধৰ্ষণ হয়ে যেত।

এসব বর্ণনা এ কথাই প্রমাণ করে যে ইলাহ মাত্র একজনই। আর তিনি হলেন আল্লাহ তায়ালা। তিনি সকল কিছুর স্বৃষ্টি, নিয়ন্ত্রক ও পালনকর্তা। তাঁর হুকুম ও নিয়মেই সবকিছু পরিচালিত হয়। কোনো সৃষ্টিই এ নিয়মের ব্যতিক্রম করতে পারে না। এসব কাজে তিনি একক ও অদ্বিতীয়। আন্তরিকভাবে এরূপ বিশ্বাসের নামই তাওহিদ বা একত্রবাদ।

আমরা তাওহিদের পরিচয় জানব। এতে বিশ্বাস স্থাপন করব। এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধি করে প্রকৃত ইমানদার হবো।

দলীয় কাজ : তাওহিদের তাৎপর্য নিজের খাতায় মুখস্ত লিখবে এবং প্রত্যেকে তার পাশের বন্ধুকে দেখাবে।

বাড়ির কাজ : তাওহিদে বিশ্বাসের ফলে ব্যক্তির জীবন ও কর্মে কী কী পরিবর্তন আসতে পারে তার একটি তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ ২

তাওহিদ ও নৈতিকতা

তাওহিদ অর্থ একত্রবাদ। আল্লাহ তায়ালা তাঁর সত্তা ও গুণাবলিতে এক ও অদ্বিতীয়-এ বিশ্বাসকে তাওহিদ বলা হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

অর্থ : “(হে নবি!) বলুন, তিনিই আল্লাহ, এক ও অদ্বিতীয়।” (সূরা আল-ইখলাস, আয়াত ০১)

আর নৈতিকতা হলো শ্রেণনীতির অনুসরণ। অর্থাৎ কথাবার্তা, আচার-আচরণে কোনো বিশেষ নীতির অনুসরণ করাকেই নৈতিকতা বলা হয়। তাওহিদ ও নৈতিকতার সমর্ক অত্যন্ত গভীর। তাওহিদের শিক্ষা মানুষকে ইসলামী নৈতিকতার দিকে পরিচালনা করে। যে ব্যক্তি তাওহিদে বিশ্বাসী, সে ইসলামী নৈতিক ও মানবিক গুণাবলিসম্পন্ন হয়ে থাকে।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের স্মর্ষ্টা। তিনি আমাদের উত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদের লালনপালন করেন। পৃথিবীর সমস্ত নিয়ামত তাঁরই দান। তিনি আমাদের বিপদাপদ থেকে রক্ষা করেন। তিনিই একমাত্র উপাস্য। তিনি ব্যক্তিত আর কোনো উপাস্য নেই। আমাদের সৃষ্টি করার মূল কারণ হলো তাঁর ইবাদত করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন -

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنََّ وَالْإِنْسََ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

অর্থ : “আমি জিন এবং মানুষকে কেবল আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।” (সূরা আয়্-যারিয়াত, আয়াত ৫৬)

সুতরাং মানুষের উচিত তাঁর ইবাদত করা, শুকরিয়া আদায় করা। জীবনযাপনের সকল ক্ষেত্রে তাঁর হুকুম ও আদেশ-নিষেধ মেনে চলা। অতএব, তাওহিদে বিশ্বাস আমাদের আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের শিক্ষা দেয়। আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য ভালো ও নৈতিক গুণাবলি অর্জনে উৎসাহিত করে। এভাবে নৈতিকতা অর্জনে তাওহিদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

তাওহিদের মূল শিক্ষা হলো আল্লাহ তায়ালাকে একক সত্তা হিসেবে বিশ্বাস করা। পাশাপাশি আল্লাহ তাঁর গুণাবলিতেও একক-এ বিশ্বাসও তাওহিদের অন্তর্গত। তাওহিদ আমাদের আল্লাহ তায়ালার নানা গুণের পরিচয় দান করে। যেমন- আল্লাহ তায়ালা রাহমান, রাহিম, করিম, গাফফার, রায়যাক, খালিক, মালিক, রব ইত্যাদি। এ সমস্ত গুণের ক্ষেত্রেও আল্লাহ তায়ালা একক। কেউই তাঁর সমকক্ষ নয়। তিনি সকল গুণে অতুলনীয়। কোনো মানুষ বা সৃষ্টির পক্ষে তাঁর এসব গুণের পূর্ণ অধিকারী হওয়া সম্ভব নয়। তবে মানুষ নিজ জীবনে এসব গুণের চর্চা করবে। উত্তম চরিত্রবান হবে। এটাই ইসলামের শিক্ষা।

আল্লাহ তায়ালার এসব গুণ নৈতিকতার সর্বোত্তম স্তর। মানুষ যখন এসব গুণাবলি অনুশীলন করে, তখন তার সকল কাজ নীতি ও আদর্শ অনুযায়ী হয়। তার দ্বারা নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে তাওহিদ মানুষকে আল্লাহ তায়ালার গুণাবলি অর্জন করতে উৎসাহিত করে।

অন্যদিকে আল্লাহ তায়ালার অন্যতম গুণ হলো শান্তিদাতা, সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। তিনি সবকিছু জানেন, সকল কিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। তিনি একমাত্র মালিক ও মহাবিচারক। এসব গুণ মানুষকে নীতি ও আদর্শ মেনে চলতে সাহায্য করে। এগুলোতে বিশ্বাস করলে মানুষ কোনো অন্যায় ও দুর্বীলি করতে পারে না। কারণ সে জানে, আল্লাহ তায়ালা তার সকল কাজ দেখছেন। তিনি এগুলোর হিসাব নেবেন। অতঃপর মন্দ কাজের জন্য শাস্তি দেবেন। এভাবেও তাওহিদের শিক্ষা মানুষকে নেতৃত্বতা প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে।

তাওহিদ মানুষকে আত্মর্যাদাশীল করে তোলে। তাওহিদে বিশ্বাসীগণ শুধু আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করেন। আল্লাহ তায়ালাকেই ইলাহ বা প্রভু হিসেবে স্বীকার করে। আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

وَلَهُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ

অর্থ : “তিনিই আল্লাহ। তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই।” (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৫৫)

সুতরাং তাওহিদে বিশ্বাসী মানুষ আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো সৃষ্টির নিকট মাথা নত করে না। কারো আনুগত্য করে না। বরং মানুষ হিসেবে নিজ মর্যাদা রক্ষায় সচেতন থাকে। অপরদিকে অবিশ্বাসীরা সকল কিছুর নিকট ভরসা করে, মাথা নত করে। এটা মানবিক আদর্শের বিপরীত। ফলে দেখা যায় যে মানুষ তাওহিদে বিশ্বাসের মাধ্যমে মানবিক গুণ ও মর্যাদা লাভ করে। তাওহিদ মানুষকে নেতৃত্বতার শিক্ষা দিয়ে থাকে।

আমরা জানতে পারলাম যে, তাওহিদ ও নেতৃত্বতার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। তাওহিদ নানাভাবে মানুষকে নেতৃত্বতার শিক্ষা দেয়। যুগে যুগে তাওহিদে বিশ্বাসী মানুষগণ ছিলেন নেতৃত্বতার উত্তম আদর্শসমূহ।

আমরাও তাওহিদে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করব। অন্যায়, অত্যাচার ও দুর্বীলি করব না। জীবনের সকল ক্ষেত্রে নেতৃত্ব ও মানবিক গুণাবলির অনুশীলন করব। আল্লাহ তায়ালা আমাদের উপর খুশি হবেন। আমাদের জীবন সুন্দর ও শান্তিময় হবে।

দলীয় কাজ : ‘শুধু তাওহিদে অট্টল বিশ্বাস মানুষকে বলিষ্ঠ ও নেতৃত্ব চরিত্র উপহার দিতে পারে।’ শ্রেণিতে বিষয়টি দলগতভাবে আলোচনা করে বিভিন্ন যুক্তি উপস্থাপনা করবে।

পাঠ ৩

কুফর (كُفْرٌ)

কুফর আরবি শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ অস্বীকার করা, অবিশ্বাস করা, গোপন করা, ঢেকে রাখা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায়, আল্লাহ তায়ালা ও ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহের কোনো একটির প্রতি অবিশ্বাস করাকে কুফর বলে। যে ব্যক্তি কুফরে লিপ্ত হয়, তাকে বলা হয় কাফির (كَافِرٌ)।

কুফর হলো ইমানের বিপরীত। কুফরের নাম দিক রয়েছে। যেমন :

- ক. আল্লাহ তায়ালাকে অস্মীকার করা।
- খ. ইমানের অন্যান্য মৌলিক বিষয়কেও অস্মীকার করা। যথা : নবি-রাসূল, আসমানি কিতাব, ফেরেশতা, পরিকাল, তকদির, পুনরুত্থান, জান্নাত-জাহানাম ইত্যাদিকে অবিশ্বাস করাও কুফর।
- গ. ইসলামের ফরজ ইবাদতগুলোকে অস্মীকার করাও কুফর। যেমন- সালাত, যাকাত, সাওম, হজ ইত্যাদি ইবাদতগুলো অস্মীকার করা।
- ঘ. হালাল জিনিসকে হারাম মনে করাও কুফর। তেমনি হারাম বস্তুকে হালাল ধারণা করাও কুফরের অস্তর্ভুক্ত। যেমন- কেউ যদি মদ, জুয়া, সুদ, ঘুষ ইত্যাদিকে হালাল মনে করে, তবে সেও কুফরি করে।

কুফরের কুফল ও পরিণতি

কুফরের কুফল ও পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। এটি নেতৃত্বকা ও মানবিক আদর্শের বিপরীত। কেননা, আল্লাহ তায়ালা আমাদের স্বষ্টা। তিনিই আমাদের রিয়িকদাতা, পালনকর্তা ও রক্ষাকর্তা। সুতরাং তাঁকে অবিশ্বাস করা কিংবা তাঁর বিধান অস্মীকার করা কোনোক্রমেই উচিত নয়। এটি চরম অকৃতজ্ঞতার শামিল। কাফিরদের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। আধিরাতে কাফিরদের স্থান হবে জাহানাম। সেখানে তারা যত্নগাদায়ক কঠিন শাস্তি ভোগ করবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ حُمْرٌ فِيهَا خَلْدُونَ

অর্থ : “যারা কুফরি করে এবং আমার নির্দেশনগুলো মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তারাই জাহানামের অধিবাসী। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।” (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ৩৯)

কুফরির শাস্তি অত্যন্ত ভয়াবহ। অবশ্য কাফির ব্যক্তি যদি পুনরায় ইমান আনে এবং ইসলামের সমস্ত মৌলিক বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে, তবে সে এ শাস্তি থেকে রেহাই পেতে পারে। সাথে সাথে তাকে অবশ্যই পূর্ববর্তী কুফরি কাজের জন্য আন্তরিকভাবে লজ্জিত হতে হবে এবং খাঁটি মনে তওবা করতে হবে।

অতএব, আমরা কুফর ও এর কুফল সম্পর্কে জেনে এ থেকে বেঁচে থাকব। এজন্য সর্বদা সতর্ক থাকব। আল্লাহ তায়ালার নিকট কুফর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করব।

দলীয় কাজ : কুফরের কুফল ও পরিণতি বর্ণনা কর।

পাঠ ৪

শিরক (الشّرْك)

শিরক শব্দের অর্থ অংশীদার সাব্যস্ত করা, সমকক্ষ মনে করা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় আল্লাহ তায়ালার সাথে অন্য কিছুকে অংশীদার সাব্যস্ত করাকে শিরক বলে। অপর কোনো কিছুকে আল্লাহ তায়ালার সমতুল্য বা সমকক্ষ মনে করাও শিরক। যে ব্যক্তি শিরক করে, তাকে বলা হয় মুশরিক (مُشْرِكٌ)।

তাওহিদের বিপরীত হলো শিরক। তাওহিদ হলো একত্ববাদ। আল্লাহ তায়ালা এক ও অদ্বিতীয়-এরূপ বিশ্বাসকে তাওহিদ বলে। পক্ষান্তরে, শিরক হলো আল্লাহ তায়ালার সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করা। কিংবা কাউকে আল্লাহর সমপর্যায়ের মনে করা। শিরক প্রধানত তিনি প্রকার। যথা :

- ক. আল্লাহ তায়ালার সত্ত্বার সাথে শিরক করা। যেমন- আল্লাহ তায়ালার পিতা, পুত্র কিংবা স্ত্রী আছে- এরূপ বিশ্বাস রাখা।
- খ. আল্লাহ তায়ালার গুণাবলিতে অংশীদার সাব্যস্ত করা। যেমন- সৃষ্টিকর্তা একজন না মেনে একাধিক সৃষ্টিকর্তার বিশ্বাস করা।
- গ. আল্লাহ তায়ালার ইবাদতে শিরক করা। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য ইবাদত না করে অন্য কারো ইবাদত করা। যেমন- অগ্নি ও মৃত্তিপুজা করা।

শিরকের কুফল ও পরিণতি

শিরক হলো জগন্যতম অপরাধ। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

অর্থ : “নিশ্চয়ই শিরক চরম যুলুম।” (সূরা লুকমান, আয়াত ১৩)

শিরকের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ তায়ালার সাথে অন্যায় আচরণ করে। কেননা আল্লাহ তায়ালাই মানুষের একমাত্র সুষ্ঠী। সকল ইবাদত ও প্রশংসা লাভের হকদারও তিনিই। শিরকের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুই ইবাদত করে। ফলে আল্লাহর সাথে চরম অন্যায় করা হয়।

অন্যদিকে শিরক মানুষের মর্যাদাহানিকর কর্মও বটে। কেননা মানুষ হলো সৃষ্টির সেরা জীব বা আশরাফুল মাখলুকাত। আল্লাহ তায়ালা সবকিছু মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন। অথচ মুশরিকরা শিরকে লিঙ্গ হয়ে অন্য সৃষ্টির কাছে মাথা নত করে। ফলে মানুষের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। এজন্যই কুরআন মজিদে শিরককে সবচেয়ে বড় যুলুম বলা হয়েছে।

শিরকের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ । আল্লাহ তায়ালা শিরকের অপরাধ ক্ষমা করেন না । তিনি বলেন :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ط

অর্থ : “নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না । তা ব্যতীত অন্য যেকোনো পাপ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন ।” (সূরা আন-নিসা, আয়াত ১১৬)

আমরা শিরক ও এর কুফল সম্পর্কে ভালোভাবে জানব এবং সর্বদা এ জগন্য গুনাহ থেকে বেঁচে থাকব । আমাদের বন্ধু-বন্ধব, আত্মীয়স্বজনদেরকে শিরকের কুফল ও শোচনীয় পরিণতির কথা বলে সতর্ক করব ।

দলীয় কাজ : কী কী কাজে শিরক হয় তার একটি তালিকা প্রস্তুত করে প্রদর্শন কর ।

বাড়ির কাজ : শিরক পরিহার করার উপায়সমূহ বর্ণনা কর ।

পাঠ ৫

ইমান মুফাস্সাল (الإِيمَانُ الْمُفَصَّلُ)

أَمَّنْتُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُنْشِيهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرٌ وَشَرٌّ هُنَّ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْثَةُ
بَعْدَ الْمَوْتِ

(উচ্চারণ : আমানতু বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহি, ওয়া কুতুবিহি, ওয়া রুসুলিহি, ওয়াল ইয়াওমিল আখিরি, ওয়াল কাদরি খাইরিহি ওয়া শাররিহি মিনাল্লাহি তাআলা ওয়াল বা'সি বা'দাল মাউত)

অর্থ : আমি ইমান আনলাম-

১. আল্লাহর প্রতি,
২. তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি,
৩. তাঁর কিতাবগুলোর প্রতি,
৪. তাঁর রাসূলগণের প্রতি,
৫. আখিরাতের প্রতি,
৬. তাকদিরের প্রতি, যার ভালো-মন্দ আল্লাহ তায়ালার নিকট থেকেই হয় এবং
৭. মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি ।

ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য

ইমান শব্দের অর্থ বিশ্বাস। আর মুফাস্সাল অর্থ বিস্তারিত। ইমান মুফাস্সাল অর্থ বিস্তারিত বিশ্বাস। বিস্তারিতভাবে ইমানের বিষয়গুলোর কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। পৃথকভাবে সবকটি বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা জরুরি। উক্ত বাক্যে ইমানের সাতটি বিষয়ের কথা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। নিম্নে এ সাতটি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো-

১. আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস

ইমানের সর্বপ্রথম বিষয় হলো মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস। পূর্বের শ্রেণিতে আমরা ইমান মুজমাল সম্পর্কে জেনেছি। সেখানে আল্লাহ তায়ালার প্রতি কিরূপ বিশ্বাস করতে হবে তা বলা হয়েছে। বস্তুত আল্লাহ তায়ালার প্রতি বিশ্বাসই ইমানের মূল। আমরা আল্লাহ তায়ালার তাওহিদ বা একত্বাদে বিশ্বাস করব। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তিনি তাঁর সত্তা ও গুণাবলিতে একক ও অতুলনীয়। তাঁর সমকক্ষ বা সমতুল্য কেউ নেই। তাঁর সুন্দর সুন্দর নাম ও গুণ রয়েছে। তিনিই একমাত্র মারুদ। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ-ই ইবাদতের যোগ্য নয়।

২. ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাস

ফেরেশতাগণ আল্লাহর এক বিশেষ সৃষ্টি। তাঁরা নুরের তৈরি। তাঁরা সর্বদা আল্লাহ তায়ালার যিকির ও তাসবিহ পাঠে রত থাকেন। তাঁদের সংখ্যা অগণিত। আল্লাহ তায়ালার হুকুম ব্যতীত তারা কোনো কাজই করেন না।

আল্লাহর নির্দেশ পালনই তাঁদের একমাত্র কাজ। ফেরেশতাগণের মধ্যে চারজন রয়েছেন নেতৃস্থানীয়। তারা হলেন: (১) হ্যরত জিবরাইল (আ.), যিনি আল্লাহর বাণী নবি-রাসূলগণের নিকট পৌছে দিতেন। (২) হ্যরত মিকাইল (আ.), যিনি আল্লাহর হুকুমে মানুষ ও জীবজন্মের জীবিকা বণ্টন কাজে নিয়োজিত আছেন। (৩) হ্যরত আয়রাইল (আ.), যিনি মানুষ ও জিনদের মৃত্যু ঘটানো বা রুহ করব করার দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত আছেন। (৪) হ্যরত ইসরাফিল (আ.), যিনি শিঙা নিয়ে আল্লাহর নির্দেশের জন্য প্রস্তুত আছেন। আল্লাহর আদেশ পাওয়া মাত্রই সিঙায় ফুর্তকার দেবেন। এতে দুনিয়া ও এর সবকিছু ধ্রংস হয়ে যাবে। তাঁর দ্বিতীয়বার ফুর্তকারে আবার সবাই জীবন ফিরে পেয়ে আখিরাতের ময়দানে বিচারের জন্য আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে। অন্য সব ফেরেশতা আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী হুকুম পালনে রত আছেন।

৩. কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস

আল্লাহ তায়ালা বহু আসমানি কিতাব নাজিল করেছেন। এগুলো সবই আল্লাহর কালাম বা বাণী। তিনি নবি-রাসূলগণের মাধ্যমে এ কিতাবগুলো মানুষের নিকট পৌছিয়েছেন। এসব কিতাব মানবজাতির জন্য আলোচ্যরূপ। এসবের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ আসমানি কিতাব হলো আল-কুরআন। এসব কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকে অবর্তীর্ণ হয়েছে, এরূপ বিশ্বাস রাখতে হবে।

৪. রাসুলগণের প্রতি বিশ্বাস

মানবজাতির হিদায়াতের জন্য আল্লাহ যুগে যুগে অসংখ্য নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন। তাঁরা মানুষকে আল্লাহ তায়ালার পরিচয় দান করেছেন। সত্য ও ন্যায়ের পথ দেখিয়েছেন। তাঁরা নিজ থেকে এসব করেননি। বরং আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েই তাঁরা তাওহিদের বাণী প্রচার করতেন। তাঁদেরকে আল্লাহর প্রেরিত নবি ও রাসুল হিসেবে বিশ্বাস করতে হবে।

৫. আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস

দুনিয়ার জীবনই মানুষের শেষ নয়। বরং আখিরাতের জীবনও রয়েছে। আখিরাত হলো পরকাল। মৃত্যুর পরপরই এ জীবনের শুরু। মানুষ সেখানে দুনিয়ার ভালো কাজের জন্য জান্নাত লাভ করবে এবং মন্দ কাজের জন্য জাহানাম পাবে। আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসও ইমানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

৬. তকদিরের প্রতি বিশ্বাস

তকদিরকে আমরা ভাগ্য বা নিয়তি বলে থাকি। সবকিছুর তকদিরই আল্লাহর হাতে। আল্লাহ তায়ালাই তকদিরের নিয়ন্ত্রক। তকদিরের ভালো-মন্দ যাই ঘটুক, সবই আল্লাহর ইচ্ছায় হয়ে থাকে। তকদির একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন। সুতরাং আমরা তকদিরে বিশ্বাস করব এবং ভালো ফল লাভের জন্য চেষ্টা করব।

৭. পুনরুত্থানের প্রতি বিশ্বাস

মৃত্যু একটি অনিবার্য সত্য। সকল জীবিত প্রাণীকেই মরতে হবে। আবার এমন একসময় আসবে, যখন আল্লাহ তায়ালা সবকিছু ধ্বংস করে দেবেন। পৃথিবীর কোনো কিছুই সেদিন অবশিষ্ট থাকবে না। কেবল আল্লাহ তায়ালাই থাকবেন। এরপর একসময় আল্লাহ তায়ালা পুনরায় সবাইকে জীবিত করবেন। মৃত্যুর পর পুনরায় এ জীবিত হওয়াকেই পুনরুত্থান বলে।

এ সময় সবাইকে হাশেরের ময়দানে একত্র করা হবে এবং দুনিয়ার সকল কাজকর্মের হিসাব নেওয়া হবে। মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার প্রতি আমাদের বিশ্বাস করতে হবে। পুনরুত্থানের প্রতি বিশ্বাস ইমানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

উপর্যুক্ত সাতটি বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস করা অপরিহার্য। এর যেকোনো একটির প্রতিও অবিশ্বাস করা যাবে না। এর কোনো একটিকেও অবিশ্বাস করলে মানুষ মুমিন হতে পারবে না। আমরা ইমান মুফাস্সালে বর্ণিত সাতটি বিষয় সম্পর্কে জানব। এগুলোর প্রতি আস্তরিকভাবে বিশ্বাস স্থাপন করব।

দলীয় কাজ : ইমানের সাতটি মূল বিষয় দলগত আলোচনার মাধ্যমে উপস্থাপন করবে।

বাড়ির কাজ : প্রত্যেকে ইমান মুফাস্সাল অর্থসহ মুখ্য করে আসবে।

পাঠ ৬

পরিচয়

আল-আসমাউল হুসনা (الْمَعْلُوْسُ الْحُسْنَى)

আল-আসমা শব্দটি ‘ইসম’ শব্দের বহুবচন। ‘ইসম’ শব্দের অর্থ নাম। আর হুসনা শব্দটি, ‘হুসনুন’ শব্দের বহুবচন। হুসনুন শব্দের অর্থ সুন্দর। আর আল-আসমাউল হুসনা অর্থ সুন্দর নামসমূহ। আল্লাহ তায়ালা সকল গুণের অধিকারী। তিনি সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিযিকদাতা, দয়াবান, ক্ষমাশীল, শাস্তিদাতা ও পরাক্রমশালী। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বদ্রষ্টা ও সর্বশক্তিমান। তিনিই মালিক। পবিত্র কুরআনে এসেছে-

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ جَّ

অর্থ : “কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়।” (সূরা আশ-শুরা, আয়াত ১১)

আল্লাহ তায়ালা অতুলনীয়। তাঁর সন্তা যেমন অনাদি ও অনন্ত, তাঁর গুণবলিও তেমনি অনাদি ও অনন্ত। আল্লাহ তায়ালার এসব গুণ নানা শব্দে নানা উপাধিতে আখ্যায়িত করা হয়। এসব গুণের প্রত্যেকটির পৃথক পৃথক নাম রয়েছে। এ নামগুলোকেই একত্রে আল-আসমাউল হুসনা বলা হয়। এই পাঠে আমরা আল্লাহ তায়ালার কতিপয় গুণবাচক নামের পরিচয় লাভ করব।

প্রভাব

মানবজীবনে আল্লাহ তায়ালার গুণবাচক নামসমূহের প্রভাব অপরিসীম। কেননা এসব গুণবাচক নাম মানবজীবনে দুদিক থেকে প্রভাব বিস্তার করে।

প্রথমত : এসব নামের দ্বারা আমরা আল্লাহ তায়ালাকে চিনতে পারি। তাঁর ক্ষমতা ও গুণবলির পরিচয় পাই। যেমন- রাহমান, রাহিম নাম দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে আল্লাহ তায়ালা দয়াবান। গাফফার নাম দ্বারা বুঝি যে মহান আল্লাহ হলেন ক্ষমাশীল। সুতরাং পাপ করে ফেললে আমরা তাঁর নিকট ক্ষমা চাই। তিনিই পারেন সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করতে।

অন্যদিকে তিনিই হলেন জাকবার (প্রবল), কাহ্হার (মহাপরাক্রান্ত)। এগুলো স্মরণ থাকলে আমরা কোনো পাপ কাজ করতে পারি না। কেননা আমরা বুঝতে পারি যে পাপ কাজ করলে তিনি আমাদের শাস্তি দেবেন।

তাছাড়া আল্লাহ তায়ালাই রিযিকদাতা, নিয়ামতদাতা, করুণাময়। ফলে আমরা তাঁর নিয়ামত উপভোগ করে তাঁর শোকরিয়া আদায় করতে পারি।

দ্বিতীয়ত: আল্লাহ তায়ালার গুণবাচক নামসমূহ আমাদেরকেও উত্তম গুণবলি অর্জনে উৎসাহিত করে।

সুতরাং আমরাও আমাদের জীবনে আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হওয়ার চেষ্টা করব। যেমন: আল্লাহ পাক দয়ালু, আমরাও সকলের প্রতি দয়া করব, তিনি ন্যায়পরায়ণ, আমরাও সকল ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণ হবো। তিনি রিযিকদাতা। আমরাও ক্ষুধার্তকে অনু দেবো। আল্লাহ তায়ালা পরম ধৈর্যশীল। আমরাও বিপদে-আপদে ধৈর্যবান করব। এভাবে আল্লাহ তায়ালার গুণবাচক নামসমূহ আমাদেরকে উত্তম চরিত্রবান হতে উৎসাহিত করে।

আল্লাহ হায়ুন (اللهُ حَمْدٌ)

হায়ুন শব্দের অর্থ চিরজীব। যিনি চিরকাল ধরে জীবিত। আল্লাহ হায়ুন অর্থ আল্লাহ চিরজীব। তিনি চিরকাল ধরে আছেন, থাকবেন। যখন কোনো কিছুই ছিল না, তখনও তিনি ছিলেন। আবার কিয়ামতে যখন সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে, তখনও তিনিই থাকবেন। তাঁর কোনো ক্ষয় নেই, রোগ-শোক, দুঃখ-জরা, তন্দু-নিদু কিছুই নেই। কোনোরূপ ধ্বংস তাঁকে স্পর্শও করতে পারে না। তিনি সকল ক্ষয় ও ধ্বংস থেকে মুক্ত। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْقَيُّومُ هُوَ لَا تَأْخُذْهُ سَنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ط

অর্থ : “তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনি চিরজীব ও সর্বসত্ত্বার ধারক। তাঁকে তন্দু অথবা নিদু স্পর্শ করে না।” (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৫৫)

আমরা আল্লাহ তায়ালার এ গুণ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করব। সকল কাজকর্মে আমরা প্রাণবন্ত থাকব। অলসতা, নির্জীবতা পরিহার করব। ঝান্তি, শ্রান্তি, তন্দু, নিদু ইত্যাদি যেন আমাদের কাজে কোনো প্রভাব না ফেলে সে চেষ্টা করব। তাহলে আমরা সফলতা লাভ করব।

আল্লাহ কায়্যমুন (اللهُ قَيْوُمٌ)

কায়্যমুন শব্দের অর্থ চিরস্থায়ী, চিরবিরাজমান, চিরবিদ্যমান, সবকিছুর ধারক সত্তা। ইসলামি পরিভাষায় সৃষ্টির তত্ত্ববধান ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে সত্তা অনাদি ও অনন্তকালব্যাপী বিরাজমান, তিনিই কাইয়্যম। অন্য কথায় আপন সত্ত্বার জন্য যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন অথচ সকল সত্ত্বার ধারক, এরূপ সত্ত্বাকে কাইয়্যম বলা হয়। আল্লাহ কায়্যমুন অর্থ আল্লাহ চিরস্থায়ী। তিনিই সবকিছুর ধারক। তিনি বিশ্ববিশ্বাতা। তিনি সর্বত্র বিরাজমান। আসমান-জমিনের সবকিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন।

আল্লাহ তায়ালা চিরবিরাজমান। তিনি সবসময় বিদ্যমান। তিনি অনাদি-অনন্ত। তিনি সবকিছু জানেন। পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু তাঁরই নিয়ন্ত্রণে।

তিনিই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং নিপুণভাবে পরিচালনা করেন। কিয়ামত পর্যন্ত সবকিছুর রক্ষক তিনিই। আখিরাতেও তিনিই একমাত্র নিয়ন্ত্রক। তিনি ব্যতীত আর কোনো চিরবিরাজমান সত্তা নেই।

আল্লাহ আযিযুন (اللهُ عَزِيزٌ)

আযিযুন শব্দের অর্থ মহাপরাক্রমশালী। আল্লাহ তায়ালাই সকল ক্ষমতার উৎস ও মালিক। তাঁর ক্ষমতা অসীম। তাঁর ক্ষমতার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। কেউ তাঁর ক্ষমতার মোকাবিলা করতে পারে না। আল-কুরআনে এসেছে—

وَاللهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقامَةٍ

অর্থ : “আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, দণ্ডনাকারী।” (সূরা আলে-ইমরান, আয়াত ৪)

আল্লাহ তায়ালা অসীম ক্ষমতাধর। কেউ তাঁকে অপারগ করতে পারে না। তাঁর সাথে খোঁকা-প্রতারণা করতে পারে না। কেউ তাঁর কৌশল বা পরিকল্পনা ব্যর্থ করতে পারে না। তিনি যা চান তা-ই হয়। তাঁর কুদরত বা ক্ষমতার ঘোকাবিলা করার শক্তি কারো নেই। তিনি যাকে ইচ্ছা অপমানিত ও লাঞ্ছিত করতে পারেন। দুনিয়ার বড় বড় ক্ষমতাবানদের তিনি ক্ষুদ্র প্রাণী বা বস্তু দ্বারা ধ্বংস করে দিয়েছেন। যেমন তিনি ফেরাউনকে পানি দ্বারা, নমুনদকে মশা দ্বারা, আবরাহাকে ছেট ছেট পাথি দ্বারা ধ্বংস করে দিয়েছেন। তাঁকে অঙ্গীকারকারী কেউই তাঁর আয়াব বা শাস্তি থেকে বাঁচতে পারেনি। ভবিষ্যতেও পারবে না।

আমরা সদাসর্বদা আল্লাহ তায়ালার এসব গুণের কথা মনে রাখব, এ গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধি করব। তাহলে সৎকাজ করা আমাদের জন্য সহজতর হবে।

আল্লাহ খাবিরুন (اللَّهُ خَبِيرُ)

খাবিরুন অর্থ সম্যক অবহিত। আল্লাহ খাবিরুন অর্থ আল্লাহ তায়ালা সবকিছু সম্যক অবহিত, সবকিছু জানেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

○ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

অর্থ : “নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সবকিছু জানেন, সকল খবর রাখেন।” (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত ১৩)

আল্লাহ তায়ালা সবকিছু জানেন। তিনি সকল বিষয়েই সম্যক অবহিত। কোনো কিছুই তাঁর নিকট অজানা নয়। আমরা যা বলি বা করি সবই তিনি জানেন। এমনকি আমরা যেসব বিষয়ের কল্পনা করি, তাও তাঁর অজানা নয়। ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর বস্তু বা প্রাণীর খবরও তিনি জানেন। গভীর সমুদ্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীর খবরও তাঁর জানা। অম্বকার রাতে কালো পাথরের উপর কালো পিপীলিকার চলাফেরাও তাঁর অজানা নয়। ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়ার মতো খালি চোখে যেসব প্রাণী দেখা যায় না, সে সম্পর্কেও তিনি সম্যক অবহিত। এককথায় আসমান-জমিন ও এ বিশ্বজগতের এমন কোনো জিনিস নেই যা তাঁর জ্ঞানের বাইরে। তিনি সবকিছু জানেন।

আমরা আল্লাহ তায়ালার এ গুণের তাৎপর্য উপলব্ধি করব। সবসময় মনে রাখব যে তিনি আমাদের সব কাজকর্ম সম্পর্কে জানেন। আমাদের সব পাপপুণ্য কিছুই তাঁর অজানা নয়। আমরা অন্যায় থেকে বিরত থাকব এবং তাঁর ভালোবাসা অর্জন করব।

আল্লাহ সাবুরুন (اللَّهُ صَبُورٌ)

সাবুরুন শব্দের অর্থ মহাধৈর্যশীল। আল্লাহ সাবুরুন অর্থ আল্লাহ মহাধৈর্যশীল। আল্লাহ তায়ালা সবচেয়ে বড় ধৈর্যশীল। তাঁর ধৈর্যের কোনো সীমা নেই।

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে নানা নিয়ামত দান করেছেন। তিনিই মানুষকে রিয়িক দেন, লালনপালন করেন। ক্ষুধা-ত্বষ্ণায় খাদ্য-পানীয় দেন। ভয়-ভীতিতে নিরাপত্তা দান করেন। আলো, বাতাস, চন্দ, সূর্য, পানি সবকিছু তাঁরই দান। সুন্দর এ পৃথিবীর সবকিছুই তিনি মানুষের কল্যাণে দান করেছেন।

এতকিছুর পরও অনেক মানুষ তাঁকে বিশ্বাস করে না। তাঁর অবাধ্য হয়। তাঁর ইবাদত ছেড়ে দেয়। আল্লাহ তায়ালা এসব ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করেন। তিনি মানুষকে নিয়ামত দান বন্ধ করে দেন না। অবাধ্য হলে তিনি যদি আলো বা পানি বন্ধ করে দিতেন, তাহলে সকলে ধূংস হয়ে যেত। অবাধ্যতার জন্য তিনি তৎক্ষণিকভাবে শাস্তিও দেন না। বরং তিনি সুযোগ দেন। মানুষ যদি তওবা করে ফিরে আসে, তবে তিনি ক্ষমা করে দেন। এরপর যদি মানুষ আবার পাপ করে তিনি পুনরায় ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করেন। বান্দা যদি আবার তওবা করে তিনি পুনরায় ক্ষমা করেন। আল্লাহ ধৈর্যশীল ব্যক্তিকে ভালোবাসেন। তিনি সর্বদা ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন। আল্লাহ বলেন—

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصُّابِرِينَ ۝

অর্থ : “নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলগণের সাথে রয়েছেন।” (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১৫৩)

ধৈর্যশীলদেরকে আল্লাহ জান্নাত দান করবেন। মহান আল্লাহ বলেন-

وَبَشِّرْ الصُّابِرِينَ ۝

অর্থ : “তুমি শুভ সংবাদ দাও ধৈর্যশীলগণকে।” (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১৫৫)

আমরাও আল্লাহ তায়ালার এ গুণের অনুশীলন করব। অধীনদেরকে ক্ষমা করব। বিপদে-আপদে নিরাশ হবো না, বরং ধৈর্যধারণ করব।

দলীয় কাজ : মানবজীবনে আল্লাহ তায়ালার গুণবাচক নামসমূহের প্রভাব বর্ণনা কর।

বাড়ির কাজ : আল্লাহর তায়ালার পাঁচটি গুণবাচক নাম অর্থসহ লেখ।

পাঠ ৭

রিসালাত (رِسَالَاتٌ)

রিসালাত অর্থ বার্তা, সংবাদবহন, চিঠি, খবর পৌছানো ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় আল্লাহ তায়ালার বাণী ও পরিচয় মানুষের নিকট পৌছানোর দায়িত্বকে রিসালাত বলে।

আল্লাহ তায়ালা মানুষের সৃষ্টিকর্তা। তিনিই একমাত্র রিযিকদাতা, রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা। কিন্তু মানুষ নিজে থেকে আল্লাহ তায়ালার পরিচয় লাভ করতে পারে না। বুদ্ধি-বিবেক খাঁটিয়ে মানুষ বুঝতে পারে যে এ মহাবিশ্বের একজন স্বীকৃত আছেন। কিন্তু তিনি কেমন, তাঁর গুণাবলি কিরূপ, তাঁর ক্ষমতা কতো-এসব কিছুই মানুষ নিজে নিজে জানতে পারে না। এজন্য প্রয়োজন পথপ্রদর্শকের। আল্লাহ তায়ালা নিজেই মানুষের মধ্য থেকে এসব পথপ্রদর্শক নিয়োগ করেছেন। তাঁরা মানুষের নিকট আল্লাহ তায়ালার সঠিক পরিচয় তুলে ধরার দায়িত্ব পালন

করেছেন। তাঁরা তাওহিদ ও আখিরাত সম্পর্কে মানুষকে ধারণা দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালার বাণী ও আদেশ-নিষেধ মানুষের নিকট পৌছে দেন। এসব দায়িত্বকেই এক কথায় রিসালাত বলা হয়। যাঁরা এসব দায়িত্ব পালন করেন, তাঁরা হলেন নবি কিংবা রাসুল। সৎপথ প্রদর্শনের জন্য মহান আল্লাহ সকল জাতির নিকট নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا

অর্থ : “এবং আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসুল পাঠিয়েছি।” (সূরা আন-নাহল, আয়াত ৩৬)

নবি-রাসুলগণ আল্লাহ তায়ালার মনোনীত বান্দা। তাঁরা পৃথিবীর সকল মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁরা ছিলেন নিষ্পাপ। দুনিয়া ও আখিরাতে তাঁরা সর্বাধিক সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী।

রিসালাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

রিসালাতে বিশ্বাস করা ইমানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাওহিদে বিশ্বাস করার সাথে সাথে আমাদের রিসালাতেও বিশ্বাস করতে হবে। কেননা রিসালাতে বিশ্বাস না করলে মুমিন হওয়া যায় না।

নবি-রাসুলগণ রিসালাতের দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁরা ছিলেন আল্লাহ তায়ালা ও মানবজাতির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনকারী। তাঁদের মাধ্যমেই আমরা আল্লাহ তায়ালার সঠিক পরিচয় পাই। তাঁরাই আমাদের নিকট মহান আল্লাহর বাণী নিয়ে এসেছেন। আল্লাহ তায়ালার আদেশ-নিষেধ, বিধি-বিধান বর্ণনা করেছেন। সুতরাং রিসালাত ও নবি-রাসুলগণের উপর বিশ্বাস করা অপরিহার্য। তাঁদেরকে অঙ্গীকার করলে ইমানের সকল বিষয়ই অঙ্গীকার করা হয়। যেমন- তোমার কোনো বন্ধু কারো মাধ্যমে তোমার নিকট কোনো সংবাদ প্রেরণ করল। এক্ষেত্রে সংবাদ বাহকের প্রতি সর্বপ্রথম বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। তাহলেই কেবল বাহকের আনীত সংবাদ বিশ্বাস করা যাবে। কেননা সংবাদ বাহককে বিশ্বাস করা না গেলে তার আনীত সংবাদও বিশ্বাস করা যায় না। এতে নানা সন্দেহের সৃষ্টি হয়। ফলে তোমার বন্ধুর উদ্দেশ্যও সাধিত হয় না।

তদুপ নবি-রাসুলগণ হলেন সংবাদ বাহকের ন্যায়। তাঁরা আল্লাহ তায়ালার বাণী মানুষের নিকট পৌছে দিয়েছেন। যদি আমরা তাঁদের অঙ্গীকার বা অবিশ্বাস করি, তাহলে তাঁদের আনীত কিভাব ও বর্ণনার মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি হবে। আল্লাহ তায়ালা, আখিরাত, কিয়ামত ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে অবিশ্বাস জন্ম নেবে। সুতরাং সর্বপ্রথম তাঁদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। আল্লাহ তায়ালাই তাঁদেরকে সংবাদ বহনের জন্য মনোনীত করেছেন- এ কথাও বিশ্বাস করতে হবে। তবেই আমরা পূর্ণাঙ্গভাবে ইমানের সব বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস করতে পারব। সুতরাং বোঝা গেল, রিসালাতে বিশ্বাস করার গুরুত্ব অপরিসীম। আমরা সকল নবি-রাসুলের প্রতি বিশ্বাস করব। কাউকে অবিশ্বাস করব না। আল-কুরআনে বলা হয়েছে-

لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُسُلِهِ

অর্থ : “আমরা তাঁর রাসুলগণের মধ্যে কোনো তারতম্য করি না।” (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৮৫)

অর্থাৎ আমরা সকলের প্রতিই বিশ্বাস করি। কারো প্রতি অবিশ্বাস করি না। নবি-রাসুলগণের প্রতি বিশ্বাস করা ফরজ। তাঁদেরকে অবিশ্বাস করলে ইমানদার হওয়া যায় না। বরং আমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা ৯০

নবি-রাসুলগণের কথায় বিশ্বাস না করে আল্লাহর গ্যবে ধ্বংস হয়ে গেছে। অতএব, আমরা সমস্ত নবি-রাসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব। হ্যরত মুহাম্মদ (স.)-এর শিক্ষা ও আদর্শ অনুসরণ করে চলব।

দলীয় কাজ : রিসালাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বর্ণনা কর।

পাঠ ৮

ওহি (ওহি)

ওহি (ওহি) আরবি শব্দ। এর অর্থ ইশারা, ইঙ্গিত, গোপন কথা ইত্যাদি। সাধারণত কোনো ব্যক্তির নিকট গোপনে প্রেরিত সংবাদকে ওহি বলা হয়।

ইসলামি পরিভাষায়, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নবি-রাসুলগণের নিকট প্রেরিত সংবাদ বা বাণীকে ওহি বলা হয়। যেমন- আল্লাহ তায়ালা আমাদের প্রিয় নবি হ্যরত মুহাম্মদ (স.)-এর উপর আল-কুরআন নাজিল করেছেন। সুতরাং আল-কুরআন হলো ওহি।

ওহি অবতরণ

আল্লাহ তায়ালা নানাভাবে নবি-রাসুলগণের নিকট ওহি প্রেরণ করতেন। তন্মধ্যে দুটি পদ্ধতি সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ।

- ক. ফেরেশতার মাধ্যমে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর বাণী ফেরেশতার মাধ্যমে নবি-রাসুলগণের নিকট পৌছাতেন।
যেমন- হ্যরত জিবরাইল (আ.) হলেন প্রধান ওহিবাহক ফেরেশতা। তিনি নবি-রাসুলগণের নিকট আল্লাহ তায়ালার বাণী নিয়ে হাজির হতেন।
- খ. সরাসরি কথা বলার মাধ্যমে। অনেক সময় আল্লাহ তায়ালা সরাসরি নবি-রাসুলগণের সাথে কথা বলতেন। যেমন- আল্লাহ তায়ালা হ্যরত মুসা (আ.)-এর সাথে তুর পাহাড়ে কথা বলেছেন। আমাদের প্রিয় নবি (স.) ও মিরাজের রাজনীতে আল্লাহ তায়ালার সাথে সরাসরি কথা বলেছেন।

প্রকারভেদ : ওহি প্রধানত দুই প্রকার। যথা-

- ক. ওহি মাতলু : অর্থাৎ যে ওহি তিলাওয়াত করা হয়। যেমন- কুরআন মজিদ। কুরআন মজিদ সালাতে তিলাওয়াত করা হয় বলে একে ওহি মাতলু বলা হয়।
- খ. ওহি গায়র মাতলু : অর্থাৎ যে ওহি তিলাওয়াত করা হয় না। যেমন- হাদিস শরিফ। হাদিস শরিফ সালাতে তিলাওয়াত করা হয় না। এজন্য একে ওহি গায়র মাতলু বলে।

মহানবি (স.)-এর বাণী, কাজ ও অনুমোদনকে হাদিস বলে। হাদিসও ওহির অন্তর্ভুক্ত। কেননা মহানবি (স.) নিজ থেকে কিছু বলতেন না বরং আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়েই তিনি কথা বলতেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন-

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوَيْ ۝ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى

অর্থ : “আর তিনি (হযরত মুহাম্মদ স.) মনগঢ়া কোনো কিছু বলেন না। বরং এটা তো ওহি, যা তাঁর প্রতি
প্রত্যাদেশ হয়।” (সূরা আল-নাজ্ম, আয়াত ৩-৪)

গুরুত্ব

ওহি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ওহি সরাসরি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে নাজিল হয়। এটা হলো অকাট্য
জ্ঞান। এতে কোনোরূপ ভুলক্রটি নেই। ওহির সংবাদ সকল প্রকার সন্দেহের উদ্দেশ্য। ওহি সকল
জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল উৎস। ওহির মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে সকল প্রকার জ্ঞান দান করেন।
আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে অবতারিত বলে এ জ্ঞান পূর্ণাঙ্গ ও অতুলনীয়। আমরা নিজেদের গৃহ সম্পর্কে
ভালোভাবে জানি। আমাদের গৃহে কোথায় কোন জিনিস রাখা আছে তা আমরাই সবচেয়ে ভালো বলতে পারব।
বাইরের কেউ তা পারবে না। তদ্বপ আমরাও অন্যের ঘরে কোথায় কী আছে তা বলতে পারব না।
তেমনিভাবে আল্লাহ সারা বিশ্বজগতের স্মৃষ্টি। তিনি নিজ কুদরতে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাঁর হুকুমেই
সকল কিছু পরিচালিত হয়। পৃথিবীর কোথায় কোন জিনিস কী অবস্থায় আছে আল্লাহই সবচেয়ে ভালো
জানেন। প্রত্যেক জিনিসের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি অবহিত। সুতরাং তিনি যে সংবাদ-
জ্ঞান নাজিল করেন তা অকাট্য। কেউ এরূপ জ্ঞান খণ্ডন করতে পারে না।

আল-কুরআন ও হাদিস ওহির মাধ্যমে প্রাপ্ত। এগুলোর মাধ্যমেই আমরা ইসলামের সকল বিধি-বিধান জানতে
পারি। তাওহিদ, রিসালাত, আখিরাত, জান্নাত, জাহানাম ইত্যাদির জ্ঞানও আমরা এগুলো থেকেই লাভ করি।
এগুলো না থাকলে আমরা কিছুই জানতে পারতাম না। সুতরাং ওহির গুরুত্ব অপরিসীম। ওহির উপর বিশ্বাস
স্থাপন করলে মানুষের ইমান পূর্ণাঙ্গ হয়।

দলীয় কাজ : শ্রেণির সব শিক্ষার্থী দুই দলে ভাগ হয়ে একদল ওহির অর্থ ও প্রকার সম্পর্কে মুখ্য বলবে এবং
অন্যদল ওহির গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করবে। আবার প্রথম দল গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করবে, দ্বিতীয় দল
ওহির অর্থ ও প্রকার সম্পর্কে মুখ্য বলবে।

পাঠ ৯

আখিরাত (الآخرة)

আখিরাত অর্থ পরকাল। পরকাল হলো ইহকালের বা দুনিয়ার জীবনের পরের জীবন। দুনিয়ার জীবনই মানুষের
শেষ জীবন নয়। বরং মানুষের জন্য আর একটি জীবন রয়েছে। সে জীবনই পরকালীন জীবন। পরকালীন জীবন
অন্ত। এ জীবনের শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন-

إِنَّمَا هُنَّ يَأْكُلُونَ الدُّنْيَا مَتَاعٌ زَّوْجَانَ الْآخِرَةِ هُنَّ دَارُ الْقَرَارِ

অর্থ : “এ দুনিয়ার জীবনতো অস্থায়ী উপভোগের বন্ধমাত্র। আর নিঃসন্দেহে আধিরাতই হলো চিরস্থায়ী আবাস।” (সূরা আল মু’মিন, আয়াত ৩৯)

আধিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব

আধিরাতে বিশ্বাস ইমানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আধিরাতে বিশ্বাস করা অপরিহার্য। আধিরাত অবিশ্বাস করলে মানুষ ইমানদার হতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের গুণাবলি সম্পর্কে বলেন-

وَبِالْأُخْرَةِ هُمْ يُؤْقَنُونَ

অর্থ : “আর তারা (মুত্তাকিগণ) আধিরাতের উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে।” (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ৪)

আধিরাত হলো পরকাল। কবর, হাশর, মিযান, সিরাত, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি আধিরাতের একেকটি পর্যায়। এ সবকটি বিষয়ের প্রতি আমাদেরকে ইমান আনতে হবে। কোনোটিই অবিশ্বাস করা যাবে না। বলা হয়ে থাকে,

اللّٰهُمَّ مَزْرَعَةُ الْآخِرَةِ

অর্থ : ‘দুনিয়া হলো আধিরাতের শস্যক্ষেত্র।’

অর্থাৎ দুনিয়া হলো আমল করার স্থান। আধিরাত হলো ফলভোগের স্থান। সেখানে মানুষ কোনো আমল করতে পারবে না। বরং দুনিয়াতে মানুষ যেরূপ আমল করেছে সেরূপ ফল ভোগ করবে। কৃষক শস্যক্ষেত্রে যেরূপ চাষাবাদ করে, সেরূপই ফল লাভ করে। জমিতে ধান লাগালে ফসল হিসেবে ধানই পাওয়া যায়। আর কেউ যদি জমিতে কাঁটাগাছ রোপণ করে তবে সে শুধু কাঁটাই লাভ করে। দুনিয়ার জীবনও তদ্দপ। আর দুনিয়াতে যে ব্যক্তি ইমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, সে আধিরাতে সম্মান ও মর্যাদা লাভ করবে। তাঁর আবাসস্থল হবে চিরশান্তির স্থান জান্নাত। অন্যদিকে যে ব্যক্তি ইমান আনবে না এবং অন্যায় ও খারাপ কাজ করবে, আধিরাতে সে শাস্তি ভোগ করবে। তার ঠিকানা হবে শান্তি ভোগের স্থান জাহান্নাম। সে জাহান্নামের আগনে চিরকাল পুড়বে। আধিরাতে কোনো মানুষ মৃত্যুবরণ করবে না। বরং চিরকাল ধরে শান্তি অথবা শাস্তি ভোগ করবে।

আধিরাতে বিশ্বাস করলে মানবজীবন সুন্দর হয়। মানুষ উত্তম চরিত্রবান হিসেবে গড়ে ওঠে। আধিরাতে বিশ্বাস মানুষকে সব ধরনের খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। এ বিশ্বাসের ফলে মানুষ কোনোরূপ অন্যায়, অত্যাচার, দুর্নীতি, মিথ্যাচার, অশ্লীল কাজকর্ম করতে পারে না। বরং সে সর্বদা উত্তম ও নেক কাজে আগ্রহী হয়। আধিরাতে শান্তির আশায় মানুষ দুনিয়াতে ভালো গুণাবলির অনুশীলন করে। ফলে মানবসমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

অতএব, আমরা আধিরাতের প্রতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করব। আধিরাতে শান্তি ও সফলতা লাভের জন্য দুনিয়ায় নেক আমল করব। আমাদের দুনিয়ার জীবন শান্তিময় হবে। আর পরকালে আমরা জান্নাত লাভ করব।

সিরাত (الصِّرَاطُ)

সিরাত শব্দের অর্থ পথ, রাস্তা, পুল, পদ্ধতি ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় সিরাত হলো জাহান্নামের উপর স্থাপিত একটি পুল। এ পুল পার হয়ে জান্নাতিগণ জান্নাতে প্রবেশ করবেন। আধিরাতে সকল মানুষকেই এ পুলের উপর আরোহণ করে তা অতিক্রম করতে হবে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা সকল মানুষের কৃতকর্মের হিসাব

নেবেন। যে নেক আমল করবে মহান আল্লাহ তাঁকে জান্নাতে যাওয়ার অনুমতি দেবেন। জান্নাতিগণ সিরাতের উপর দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। তাঁদের আমল অনুসারে সিরাত নানারকম হবে। কারো জন্য সিরাত হবে বিশাল ময়দানের মতো। আবার কম নেককারদের জন্য তাদের আমল অনুসারে সিরাতের প্রশস্ত কম হবে। ইমানদারগণ নিজ নিজ আমল অনুযায়ী সিরাত অতিক্রম করবেন। কেউ বিদ্যুৎগতিতে সিরাত পার হবেন। কেউ বাড়ের গতিতে, কেউ ঘোড়ার গতিতে, কেউ দৌড়ের গতিতে, আবার কেউ হেঁটে হেঁটে সিরাত পার হবেন। কম আমলকারী জান্নাতিগণ হামাগুঁড়ি দিয়ে অতিক্রমে সিরাত পার হবেন।

সিরাত হলো অল্পকার পুল। সেখানে ইমান ও নেক আমল ব্যতীত আর কোনো আলো থাকবে না। সুতরাং দুনিয়ায় যে দৃঢ় ইমান এবং বেশি নেক আমলের অধিকারী হবে, সিরাত হবে তাঁর জন্য সবচেয়ে বেশি আলোকিত। ইমানের আলোতে সে সহজেই সিরাত অতিক্রম করবে। জান্নাতিগণের মধ্যে সর্বপ্রথম আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স.) সিরাত অতিক্রম করে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। তাঁর পূর্বে কেউই এ মর্যাদা লাভ করবে না।

অন্যদিকে জাহানামদের জন্য সিরাত অত্যন্ত ভয়াবহ স্থান। তাদের জন্য সিরাত হবে চুলের চাইতেও সূক্ষ্ম এবং তরবারি অপেক্ষা ধারালো। সেখানে কোনো আলো থাকবে না। বরং সিরাত হবে ঘুটছুটে অল্পকার। এমন অবস্থায় তারা সিরাতে আরোহণ করবে। তারা কিছুতেই সিরাত অতিক্রম করতে পারবে না। বরং তাদের হাত-পা কেটে তারা জাহানামে পতিত হবে।

সিরাত সম্পর্কে পরিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন,

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارْدُهَا هُكَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتَّمًا مَقْضِيًّا

অর্থ : “এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তা অতিক্রম করবে, এটা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত।” (সূরা মারহিয়াম, আয়াত ৭১)

এ সম্পর্কে মহানবি (স.) বলেন,

يُوضَحُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظُهُرٍ وَجَهَنَّمَ

অর্থ : “জাহানামের উপর সিরাত স্থাপিত হবে।” (মুসনাদে আহমাদ)

আমরা সিরাতে বিশ্বাস করব। সহজে সিরাত অতিক্রম করার জন্য দুনিয়াতে বেশি বেশি নেক আমল করব।

মিয়ান (المِيزَان)

মিয়ান অর্থ দাঙ্গিপালা, তুলাদণ্ড, মানদণ্ড বা পরিমাপ করার যন্ত্র। ইসলামি পরিভাষায় যে পরিমাপক যন্ত্রের দ্বারা কিয়ামতের দিন মানুষের পাপপূণ্যকে ওজন করা হবে, তাকে মিয়ান বলা হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَنَصَحُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ

অর্থ : “আর আমি কিয়ামতের দিন ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব।” (সূরা আল-আমিয়া, আয়াত ৪৭)

আমরা নিশ্চয়ই দাঢ়িগাল্লা দেখেছি। এর দুটি পাল্লা থাকে এবং মাঝে একটি দণ্ড থাকে। এগুলোর মাধ্যমে আমরা নানা জিনিস পরিমাপ করে থাকি। মিয়ানও তেমনি একটি মানদণ্ড। এর দুটি পাল্লাতে মানুষের সকল আমল ওজন করা হবে। এর এক পাল্লায় থাকবে পুণ্য এবং অন্য পাল্লায় উঠানে হবে পাপ। যে ব্যক্তির পুণ্যের পাল্লা ভারী হবে সে হবে জান্নাতি। আর যে ব্যক্তির পুণ্যের পাল্লা হালকা হবে এবং পাপের পাল্লা ভারী হবে, সে জাহানামি হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

فَمَنْ تَقْلِبْتُ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ
الَّذِينَ حَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُوْنَ ۝

অর্থ : “এবং যাদের পাল্লা (পুণ্যের) ভারী হবে, তারাই হবে সফলকাম। আর যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে, তারা জাহানামে চিরস্থায়ী হবে।” (সূরা আল-মুমিনুন, আয়াত ১০২-১০৩)

মিয়ানের পাল্লায় পুণ্য বা নেক কাজ বেশি হলে মানুষ সফলতা লাভ করবে। তার স্থান হবে জান্নাত। এজন্য বেশি বেশি নেক কাজ করা উচিত। প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ(স.) আমাদের নেকির পাল্লা ভারী করার জন্য বহু আমল শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেন-

الْحَمْدُ لِلَّهِ تَمَلَّا لِبِيْزَان

অর্থ : ‘আল-হামদুলিল্লাহ’ বলা মিয়ানের নেকির পাল্লা পূর্ণ করে দেয়।’ (সহিত মুসলিম)

অন্য হাদিসে রাসুলল্লাহ (স.) বলেন- ‘দুটি বাক্য এমন আছে, যা দয়াময় আল্লাহর নিকট প্রিয়, উচ্চারণে সহজ এবং মিয়ানের পাল্লায় ভারী। এ দুটি বাক্য হলো-

سُبْحَانَ اللَّهِ وَسُبْحَانِ رَسُولِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ -

উচ্চারণ : সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আখিম।

অর্থ : ‘পবিত্রতা ও প্রশংসা আল্লাহর জন্য, তিনি মহান ও অতিশয় পবিত্র।’

আমরা এ দোয়া দুটি শিখব এবং বেশি বেশি পাঠ করব। এতে আমাদের নেকির পাল্লা ভারী হবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের ভালোবাসবেন এবং আমরা আখিরাতে সফলতা লাভ করব।

দলীয় কাজ : আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব উল্লেখ কর।

বাড়ির কাজ : আখিরাতের পর্যায়গুলোর একটি তালিকা তৈরি কর।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. কুফরের কুফল ও পরিণতি |
২. ইমানের সর্বপ্রথম বিষয় হলো প্রতি বিশ্বাস |
৩. আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় |
৪. হায়ন শব্দের অর্থ |
৫. রিসালাতে বিশ্বাস না করলে হওয়া যায় না |

বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর

বাম পাশ	ডান পাশ
১. আকাইদের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান বিষয় হলো	বিপরীত
২. কুফর হলো ইমানের	অপরিসীম
৩. নিচয়ই শিরক চরম	শস্যক্ষেত্র
৪. মানবজীবনে আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহের প্রভাব	তাওহিদ
৫. দুনিয়া হলো আখিরাতের	জুলুম

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কুফর অর্থ কী? উদাহরণসহ লেখ।
২. কী কী কাজ করলে কুফর প্রমাণিত হয়। পাঁচটি উদাহরণ দাও।
৩. রিসালাতের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. তাওহিদের গুরুত্ব বর্ণনা কর।
২. ইমান মুফাস্সালের বিষয়গুলো বর্ণনা কর।
৩. ‘কাফিরদের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ’ – উক্তিটির বিশ্লেষণ কর।
৪. ওহির প্রকারভেদ লিখে ওহি নাজিলের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। মহান আল্লাহকে একক সন্তা হিসেবে বিশ্বাস করাকে কী বলে?

- | | |
|-----------|------------|
| ক. আকাইদ | খ. তাকওয়া |
| গ. তাওহিদ | ঘ. আনুগত্য |

২। শিরকের মাধ্যমে মানুষ -

- i. আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর ইবাদত করে
- ii. রিসালাতে অবিশ্বাস করে
- iii. অন্য সৃষ্টির কাছে মাথা নত করে

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | | | |
|----|----------|----|-------------|
| ক. | i | খ. | i ও iii |
| গ. | ii ও iii | ঘ. | i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি গড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উভয়ের দাও :

ছামি ও সাকিব বন্ধু। ছামি নামায আদায় করে, কিন্তু সাকিব তা আদায় করতে অস্বীকৃতি জানায়। ছামি এ ধরনের আচরণ থেকে বিরত থাকার জন্য সাকিবকে বোঝানোর চেষ্টা করে।

৩। সাকিবের এ কাজটি কিসের শামিল?

- | | |
|--------------|--------------|
| ক. কুফরিয়া | খ. মুনাফিকির |
| গ. বিদ্যাতের | ঘ. শিরকির |

৪। ছামির বোঝানোর বিষয়টি হচ্ছে -

- i. সামাজিক দায়িত্ব পালন
- ii. ইমানি দায়িত্ব পালন
- iii. মুওকি হওয়ার বাসনা

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-----------|------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. i ও ii | ঘ. i ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। সমাজপতি রাজা মিয়ার ভয়ে মানুষ তটস্থ থাকে। মানুষের সাথে সবসময় খারাপ ব্যবহার এবং তিনি যা বলেন তাই করতে বাধ্য করেন। তাঁর প্রকল্পে কর্মরত জনাব ফরিদ উদ্দিনকে নামায পড়তে নিষেধ করে বলেন, নামায আবার কিসের জন্য, কাজ কর তাহলেই সুখ পাবে। কিন্তু ফরিদ উদ্দিন নিয়মিত নামায আদায় করেন এবং তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন। অবশেষে কর্তৃপক্ষ ফরিদ উদ্দিনের দায়িত্বশীলতায় খুশি হয় এবং তাঁকে পদোন্নতি দেয়।

- ক. তাওহিদ শব্দের অর্থ কী?
- খ. আখিরাত বলতে কী বোঝায়?
- গ. নামাযের প্রতি রাজা মিয়ার মনোভাব ইসলামের দৃষ্টিতে কীসের শামিল? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. যে মূল বিশ্বাসের ফলে ফরিদ উদ্দিন নামাযে দৃঢ় ও দায়িত্বশীল-তা বিশ্লেষণ কর।

২। বিজ্ঞ বিচারক জাকারিয়া সাহেব ন্যায়বিচার করেন। এতে ঘুষ লেনদেনকারী তাঁর উপর ক্ষিপ্ত হয়। এমনকি তাঁকে বদলি করার চেষ্টা করে। বিচারক সাহেব এটা জানার পরেও ঠাণ্ডা মাথায় ধৈর্যধারণ করেন। আসমাউল হুসনার বিষয়গুলো নিজের জীবনে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করেন এবং আল্লাহর ভয়ে সবসময় ভীত থাকেন। বিচারকের এমন মহৎ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেখে অবশেষে ঘুষ লেনদেনকারী তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়।

- ক. আসমাউল হুসনার অর্থ কী?
- খ. আসমাউল হুসনা সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান থাকা আবশ্যিক কেন? বুবিয়ে লেখ।
- গ. আল্লাহর যে গুণের ভয়ে বিচারপতি ভীত থাকেন তা ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. ‘আল্লাহ সাবুরুন’ গুণের সাথে বিচারকের গুণের সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইবাদত (الْعِبَادَةُ)

‘ইবাদত’ আরবি শব্দ। এর অর্থ দাসত্ব, বন্দেগি, আনুগত্য ইত্যাদি। আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূলুল্লাহ (স.) প্রদর্শিত পন্থায় জীবন পরিচালিত করাকেই ইবাদত বলে। সালাত, সাওম, যাকাত, হজ ইত্যাদি আমরা যেমনি ইবাদত হিসেবে পালন করে থাকি, তেমনি জীবনের প্রতিটি কাজ ইসলামি বিধি-বিধান মোতাবেক সম্পন্ন করাও ইবাদতের অংশ। আল্লাহ জিন ও মানবসন্তানকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন।

এ অধ্যায় শেষে আমরা –

- জামাআতে সালাত আদায়ের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব।
- ইমাম ও মুন্তাদির দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্ণনা করতে পারব।
- বিভিন্ন প্রকার সালাতের পরিচয় – মাস্বুকের সালাত, মুসাফিরের সালাত, রুগ্ন ব্যক্তির সালাত, জুমার সালাত, ঈদের সালাত, জানায়ার সালাত, তারাবিহের সালাত, তাহাঙ্গুদের সালাত, আওয়াবিনের সালাত ও ইশরাকের সালাত সম্পর্কে বলতে পারব।
- সালাতের আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সাওমের ধারণা, প্রকারভেদ এবং সাওম ভঙ্গের কারণ, সাওম মাকরুহ হওয়ার কারণ, সাওমের কাষা ও কাফ্ফারা সম্পর্কে বলতে পারব।
- সাহারি ও ইফতারের পরিচয়, সময়সূচি ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব।
- ইতিকাফ এবং সাদাকাতুল ফিতরের ধারণা, তাৎপর্য ও আদায়ের নিয়ম ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সাওমের নৈতিক উপকার সম্পর্কে বলতে পারবে। বাস্তব জীবনে সৎসন, সহমর্মিতা ও সহিষ্ণুতা অনুশীলনে সাওমের (রোয়ার) গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারব।

পাঠ ১

সালাত (الصَّلَاةُ)

ইসলামের মৌলিক পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে সালাত বা নামায অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। আল্লাহর নিকট বান্দার আনুগত্য ও বিনয় প্রকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম হচ্ছে সালাত। সালাতের মাধ্যমেই বান্দা আল্লাহর সবচেয়ে বেশি নৈকট্য লাভ করতে পারে।

সালাত হচ্ছে জান্নাতের চাবিকাঠি ও আল্লাহর সঙ্গে আধ্যাত্মিক সংযোগ স্থাপনের মাধ্যম। সালাত মানুষকে অশ্লীলতা ও গর্হিত কর্মকাণ্ড হতে বিরত রাখে। সালাতের প্রভাবে মানুষ শৃঙ্খলাবোধ, সময়ানুবর্তিতা, কর্তব্য-পরায়ণতা ইত্যাদি গুণে গুণান্বিত হয় এবং ধনী-গরিব, সাদা-কালো মানুষের মধ্যে সাম্য ও ভাতৃত্ববোধ জাগ্রত হয়।

জামাআতে সালাত

জামাআত আরবি শব্দ। এর অর্থ একত্রিত হওয়া, সমবেত হওয়া প্রভৃতি। ইসলামি পরিভাষায়, নির্ধারিত সময়ে নির্দিষ্ট জায়গায় মুসলিম সম্পদায় ইমামের সঙ্গে একত্রিত হয়ে সালাত আদায় করাকে জামাআতে সালাত আদায় বলে।

জামাআতে সালাত আদায়ের গুরুত্ব

ফরজ সালাত একাকী আদায় করার চেয়ে জামাআতে আদায় করার প্রতি বিশেষ তাগিদ রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَإِذْ كُعُوا مَعَ الرِّكَعَيْنَ ۝

অর্থ : “তোমরা বুকুকারীদের সাথে বুকু কর।” (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ৪৩)

নবি করিম (স.) জামাআতে সালাত আদায়ের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছেন, ‘একাকী সালাত আদায় অপেক্ষা জামাআতে আদায় করলে সাতাশগুণ বেশি সাওয়াব পাওয়া যায়।’ (বুখারি ও মুসলিম)। জামাআতে সালাত আদায়কারীকে নবি করিম (স.) খুবই পছন্দ করতেন। তিনি নিজে কখনো জামাআত ত্যাগ করেননি। আবার কেউ জামাআতে উপস্থিত না হলে তিনি ধোঁজ নিতেন এবং এতে মহানবি (স.) অসম্মত হতেন। তাই আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন ও অধিক সাওয়াব পাওয়ার আশায় প্রত্যেক মুমিন বান্দাকে জামাআতে সালাত আদায় করতে হবে।

ইমাম

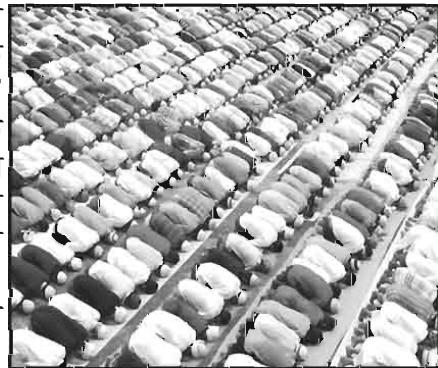
ইমাম অর্থ নেতা। যিনি সালাত পরিচালনা করেন, তিনিই ইমাম। অন্য কথায়, জামাআতে সালাত আদায়ের সময় মুসল্লিগণ (মুস্তাদি) যাকে অনুসরণ করে সালাত আদায় করে, তাকে ইমাম বলে। যার কিরাআত শুন্দ, সুন্দর ও ইসলামি জ্ঞান বেশি এবং বয়সে বড় তিনিই ইমাম হওয়ার যোগ্য। তাই একজন যোগ্য ব্যক্তিকে ইমাম হিসেবে নির্বাচন করা উচিত।

ইমামের কর্তব্য

ইমামের কর্তব্য হচ্ছে সালাতে কাতার সোজা হলো কি না সেদিকে দৃষ্টি রাখা। মুসল্লিদের মধ্যে সুসম্পর্ক রক্ষা করা। সৎ উপদেশ দেওয়া এবং মুসল্লিদের প্রতি দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা। ইমাম হিংসা, বিদ্রে, প্রবৃত্তির অনুসরণ ও ইসলাম বহির্ভূত কাজকর্ম থেকে দূরে থাকবেন। তাঁর উচিত মুসল্লিদের অবস্থা দেখে সালাতে তিলাওয়াত দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত করা। মুসল্লিদের মধ্যে অনেকে বৃন্দ, রুগ্ণ, দুর্বল ও মুসাফির থাকতে পারে, তাই ইমামকে সকলের প্রতি লক্ষ্য রেখে সালাত আদায় করতে হবে। জামাআতে সালাত আদায়ের মাধ্যমে মানুষকে শৃঙ্খলাবোধ, সময়ানুবর্তিতা ও নেতার প্রতি আনুগত্য শিক্ষা দেয়। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দূর করে এবং সামাজিক ঐক্যের প্রতিফলন ঘটায়।

মুক্তাদি

ইমামের পেছনে দাঁড়িয়ে তাঁকে অনুসরণপূর্বক যারা সালাত আদায় করে, তাঁদের মুক্তাদি বলা হয়। মুক্তাদি এই বলে সালাতের নিয়ত করবে যে, ‘আমি এই ইমামের পেছনে সালাত আদায় করছি।’ সালাতের যাবতীয় কাজে মুক্তাদিকে ইমামের অনুসরণ করতে হবে। মুক্তাদিগণ ইমামের পেছনে দাঁড়াবে। যদি মুক্তাদি একজন হয় তবে ইমামের ডান দিকে কিছুটা পেছনে দাঁড়াবে। যদি ইমাম তিলাওয়াতে ভুল করেন, তাহলে নিকটবর্তী মুক্তাদি সংশোধন করে দেবে। আর যদি অন্য কোনো কাজে ভুল করেন, যেমন : দাঁড়ানোর পরিবর্তে বসে, বসার পরিবর্তে দাঁড়ায়, তবে ‘সুব্হানাল্লাহ্’ বলে ইমামকে সংশোধন করে দেবে। (বুখারি)



সালাত শেষে মুসলিমগণ একে অপরের সাথে কুশল বিনিময় করবে। নিয়মিত কোনো মুসলি অনুপস্থিত থাকলে তার খোঁজ খবর নেবে। নিয়মিতভাবে উক্ত অভ্যাস চর্চা করলে গভীর আত্মবোধ গড়ে উঠবে। ইমামের ভুল হলে বিরোধিতা না করে সংশোধনের জন্য সহযোগিতা করবে।

দলীয় কাজ: শিক্ষার্থীরা দলে ভাগ হয়ে ইমাম ও মুক্তাদির কর্তব্যগুলোর একটি তালিকা তৈরি করে পোস্টার পেপারে মার্কার দিয়ে লিখবে।

বাড়ির কাজ: জামাআতে সালাত আদায়ের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

পাঠ ২

বিভিন্ন প্রকার সালাত

মাস্বুকের সালাত (صلوة المسبوق)

যে ব্যক্তি নামাযে এক বা একাধিক রাকআত শেষ হওয়ার পর ইমামের সাথে জামাআতে অংশগ্রহণ করে, তাকে মাস্বুক বলে।

মাস্বুকের সালাত আদায়ের নিয়ম

মুসলি জামাআতে সালাত আদায় করতে গিয়ে ইমামকে যে অবস্থায় পাবে সে অবস্থাতেই নিয়ত করে নামাযে অংশগ্রহণ করবে। তারপর ইমামের সাথে যথারীতি বুকু সিজদাহ করে তাশাহহুদ পাঠের জন্য বসে যাবে। ইমাম সালাম ফিরালে সে মুসলি সালাম না ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে এবং ছুটে যাওয়া রাকআতগুলো বুকু, সিজদাহ করে যথারীতি তাশাহহুদ, দর্রাদ, দোয়া মাসুরা পড়ে সালামের মাধ্যমে সালাত শেষ করবে। বুকুসহ ইমামের সাথে যে কয় রাকআত পাওয়া যায় তা আদায় হয়ে যায়। বুকুর পর ইমামের পেছনে ইস্তেদা বা নামাযে দাঁড়ালে ঐ রাকআত মাস্বুককে আদায় করতে হবে।

মুক্তাদির সালাত এক, দুই, তিন, চার রাকআত ছুটে গেলে, তা আদায়ে কিছুটা তারতম্য রয়েছে।

নিম্নে এসবের বর্ণনা করা হলো :

মুক্তাদি ইমামের পেছনে ইক্তেদা করার পর যদি এক রাকআত ছুটে যায়, তবে ইমামের সালাম ফেরানোর পর দাঁড়িয়ে যাবে এবং ছুটে যাওয়া এক রাকআত একাকী সালাত আদায়ের ন্যায় আদায় করে নেবে।

দুই রাকআত ছুটে গেলে ইমামের সালাম ফেরানোর পর মুক্তাদি দাঁড়িয়ে যাবে এবং ছুটে যাওয়া দুই রাকআত যথানিয়মে আদায় করবে, যেভাবে ফজরের দুই রাকআত ফরজ সালাত একাকী আদায় করা হয়।

তিন রাকআত ছুটে গেলে ইমামের সালাম ফেরানোর পর মুক্তাদি দাঁড়িয়ে যাবে। এক রাকআত যথানিয়মে আদায় করে প্রথম বৈঠক করবে। এ বৈঠকে তাশাহুদ পড়ার পর আবার দাঁড়িয়ে যাবে এবং বাকি দুই রাকআত যথানিয়মে আদায় করে শেষ বৈঠকে তাশাহুদ, দরবণ, দোয়া মাসুরা পড়ে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করবে।

চার, তিন, দুই রাকআত বিশিষ্ট নামাযে মুক্তাদি ইমামকে শেষ বৈঠকে পেলে ইমামের সালাম ফেরানোর পর মুক্তাদি দাঁড়িয়ে যাবে। যথানিয়মে ছুটে যাওয়া রাকআতগুলো এমনভাবে আদায় করে নেবে, যেভাবে একজন মুসল্লি একাকী চার, তিন, দুই রাকআত বিশিষ্ট সালাত আদায় করে থাকে।

দলীয় কাজ : কোনো এক শিক্ষার্থী মাগারিবের নামায আদায় করতে মসজিদে গিয়ে ইমামের সাথে এক রাকআত পেয়েছে। অবশিষ্ট নামায কীভাবে আদায় করবে? শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে আলোচনা করবে।

মুসাফিরের সালাত (صَلْوَةُ الْمُسَافِرِ)

‘মুসাফির’ আরবি শব্দ। এর অর্থ ভ্রমণকারী। কমপক্ষে ৪৮ মাইল দূরবর্তী কোনো স্থানে যাওয়ার নিয়তে কোনো ব্যক্তি বাড়ি থেকে বের হলে শরিয়তের পরিভাষায় তাকে মুসাফির বলে। এমন ব্যক্তি গন্তব্যস্থলে পৌঁছে কমপক্ষে পনেরো দিন অবস্থানের নিয়ত না করা পর্যন্ত তার জন্য মুসাফিরের হুকুম প্রযোজ্য হবে। শরিয়তে মুসাফিরকে সংক্ষিপ্ত আকারে সালাত আদায়ের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এই সংক্ষিপ্তকরণকে আরবিতে কসর বলা হয়। মুসাফির অবস্থায় যোহর, আসর ও এশার ফরজ সালাত কসর পড়তে হয়। যেমন, আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ

অর্থ : “যখন তোমরা দেশ-বিদেশে সফর করবে, তখন সালাত সংক্ষিপ্ত করলে তোমাদের কোনো দোষ নেই।”

(সূরা আন-নিসা, আয়াত ১০১)

মুসাফিরের জন্য কসর সালাত আদায় করার অনুমতি আল্লাহ তায়ালার এক বিশেষ অনুগ্রহ। এই অনুগ্রহের পুরুষ সম্পর্কে মহানবি (স.) বলেন: ‘এটি একটি সাদাকা, যা আল্লাহ তায়ালা তোমাদের (মুসাফিরদের) দান করেছেন। এ সাদাকা তোমরা গ্রহণ কর।’ (বুখারি ও মুসলিম)

মুসাফিরের সালাত আদায়ের নিয়ম

চার রাকআত বিশিষ্ট অর্থাৎ যোহর, আসর ও এশার ফরজ সালাত মুসাফির ব্যক্তি দ্রুই রাকআত করে আদায় করবে। ফজর, মাগরিব ও বিতরের নামাযে কসর নেই। এগুলো পুরোপুরি আদায় করতে হবে।

আল্লাহর দেওয়া সকল সুযোগ-সুবিধা খুশি মনে গ্রহণ করা উচিত। কাজেই কোনো মুসাফির ব্যক্তি যদি ইচ্ছে করে যোহর, আসর বা এশার ফরজ সালাত চার রাকআত আদায় করে, তবে আল্লাহর দেওয়া সুযোগ গ্রহণ না করায় গুনাহগার হবে। কিন্তু ইমাম যদি মুকিম (স্থায়ী) হয়, তাহলে সে ইমামের অনুসরণ করে পূর্ণ সালাত আদায় করবে। সফর একটি কষ্টকর বিষয়। তাই আল্লাহ তাঁর বান্দার উপর সালাত সংক্ষিপ্ত করার অনুমতি প্রদান করেছেন।

দলীয় কাজ : মুসাফির অবস্থায় কোন কোন নামায পূর্ণ এবং কোন কোন নামায কসর পড়তে হয় তার একটি তালিকা পোস্টারে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

রুগ্ণ ব্যক্তির সালাত (صلوةُ الْبَرِيْض)

রোগী বা অক্ষম ব্যক্তি যথানিয়মে সালাত আদায় করতে না পারলে, তার জন্য ইসলামে সহজ নিয়মের অনুমোদন রয়েছে। রোগীর সেই সহজ নিয়মে সালাত আদায়কে রুগ্ণ ব্যক্তির সালাত বলে।

রুগ্ণ ব্যক্তির সালাত আদায়ের নিয়ম

রুগ্ণ ব্যক্তির জন্য জ্ঞান থাকা পর্যন্ত সালাত আদায় করা বাধ্যতামূলক। রোগ যত কঠিন হোক না কেন, সম্পূর্ণরূপে অপারগ না হলে সালাত ত্যাগ করা যাবে না। রোগীর দাঁড়াতে কষ্ট হলে বসে বুকু-সিজদাহ্র সাথে সালাত আদায় করবে। বুকু-সিজদাহ্র করতে অক্ষম হলে বসে ইশারায় সালাত আদায় করবে। ইশারা করার সময় বুকু অপেক্ষা সিজদায় মাথা একটু বেশি নত করতে হবে। মাথা দিয়ে ইশারা করতে হবে, ঢোকে ইশারা করলে সালাত আদায় হবে না। রুগ্ণ ব্যক্তিকে বসার সময় সালাতের অবস্থায় বসতে হবে। যদি রোগী এতোই দুর্বল হয় যে বসে থাকা সম্ভব নয়, তবে কিবলার দিকে পা দুটি রাখতে হবে। পা সোজা না রেখে হাঁটু উঁচু করে রাখতে হবে এবং মাথার নিচে বালিশ বা এ জাতীয় কিছু জিনিস রেখে মাথা একটু উঁচু রাখতে হবে। শুয়ে ইশারায় বুকু ও সিজদাহ্র করবে অথবা উত্তর দিকে মাথা রেখে কাত হয়ে শুয়ে এবং কিবলার দিকে মুখ রেখে ইশারায় সালাত আদায় করবে। যদি এভাবেও সালাত আদায় করা সম্ভব না হয়, তবে তার উপর সালাত আর ফরজ থাকে না, মাফ হয়ে যায়। অপারগ অবস্থায় বা কেউ বেঁহুশ হয়ে পড়লে যদি চিবিশ ঘট্টা সময় অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের বা তার চেয়ে কম সময় অতিক্রান্ত হয়, তাহলে সক্ষম হওয়ার পর রুগ্ণ ব্যক্তিকে কায়া করতে হবে। যদি পাঁচ ওয়াক্তের বেশি সময় অতিবাহিত হয়, তবে আর কায়া করতে হবে না। এতে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে সালাত এমন একটি ইবাদত, যা সক্ষমতার শেষ সীমা পর্যন্ত আদায়ের তুকুম দেওয়া হয়েছে। কোনোভাবেই সালাত ত্যাগ করা যায় না।

দলীয় কাজ : রুগ্ণ ব্যক্তির নামায আদায়ের পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিতে আলোচনা করবে।

জুমার সালাত (صَلُوةُ جُمْعَةٍ)

সালাত এবং জুমুআ দুটিই আরবি শব্দ। প্রচলিত ভাষায় বলা হয় জুমার সালাত। শুক্রবার যোহরের সময়ে যোহরের সালাতের পরিবর্তে যে সালাত আদায় করা হয়, তাকে বলা হয় জুমার সালাত। প্রতি শুক্রবার জামে মসজিদে জুমার সালাত জামাআতে আদায় করা হয়।

গুরুত্ব

পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের ন্যায় প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক, বৃদ্ধিমান, স্বাধীন, মুসলিম পুরুষের উপর জুমার সালাত আদায় করা ফরজ। আর এর অস্থীকারকারী কাফির। অবহেলা করে কেউ এ সালাত আদায় না করলে সে ফাসিক হয়ে যাবে। জুমার সালাতের গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْتَعِوْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ طِلْكُمْ خَيْرٌ لِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

অর্থ : “হে মুমিনগণ। জুমার দিনে যখন সালাতের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ কর, এটি তোমাদের জন্য শেয়, যদি তোমরা উপলব্ধি কর।” (সূরা আল-জুমুআ, আয়াত ৯)।

জুমার দিন সপ্তাহের উত্তম দিন। এদিনে হ্যরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করা হয়। এদিনে তাঁর তওবা করুল হয়। এদিনেই কিয়ামত সংঘটিত হবে। এদিন দোয়া করুলের উত্তম দিন। এ প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, ‘যে ব্যক্তি শুক্রবারে গোসল করে যথাসম্ভব পবিত্র হয়ে সুগন্ধি লাগিয়ে জুমার সালাত আদায়ের জন্য মসজিদে যায়, মসজিদে গিয়ে কাউকে কষ্ট না দিয়ে যেখানে জায়গা পায় সেখানেই বসে যায়, যথাসম্ভব সালাত আদায় করে এবং নীরবে বসে মনোযোগ সহকারে খুতবা শোনে, আল্লাহ তায়ালা তার বিগত জুমা হতে এ জুমা পর্যন্ত সকল (সগিরা) গুনাহ মাফ করে দেবেন।’ (বুখারি)

জুমার সালাত আদায় না করলে ইসলামে কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে। যেমন : মহানবি (স.) বলেন, ‘যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে পরপর তিন জুমা ত্যাগ করে, তার অন্তরে যোহর মেরে দেওয়া হয় এবং তার অন্তরকে মুনাফিকের অন্তরে পরিণত করে দেওয়া হয়।’ (তিরমিয়ি)

জুমার সালাত আদায়ের নিয়ম

প্রথমে মসজিদে গিয়ে তাহিয়াতুল ওয়ু ও দুখুলুল মসজিদ দুই দুই রাকআত করে নফল সালাত আদায় করতে হয়। ফরজের আগে চার রাকআত কাবলাল জুমা ও পরে চার রাকআত বাঁদাল জুমা আদায় করা সুন্নতে মুয়াক্তাদাহ।

জুমার সালাতের জন্য দুটি আযান দেওয়া হয়। প্রথম আযান মসজিদের বাইরে মিনারে, দ্বিতীয়টি মসজিদের ভিতরে ইমাম সাহেব খুতবা দিতে মিস্বরে বসলে দেওয়া হয়। জুমার দুই রাকআত ফরজের পূর্বে ইমাম সাহেব মুসল্লিদের উদ্দেশ্যে মিস্বরে দাঁড়িয়ে খুতবা দেন। মুসল্লিদের খুতবা শোনা ওয়াজিব। এ সময় কথা বলা, অনর্থক কিছু করা নিষেধ। খুতবা শেষে ইমামের সাথে দুই রাকআত ফরজ সালাত অন্যান্য ফরজ সালাতের ন্যায় আদায়

করতে হয়। জুমার ফরজের জন্য জামাআত শর্ত। জামাআত ছাড়া জুমা সালাত হয় না। কোনো কারণে জুমাতে অংশগ্রহণ করতে না পারলে যোহরের সালাত আদায় করতে হয়। কাজেই জুমার সালাত যোহরের সময়েই পড়তে হবে।

সামাজিক শিক্ষা

জুমার সালাতে এলাকার লোকজন একত্রিত হয়। পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ হয় এবং কুশলাদি বিনিয়য়ের সুযোগ হয়। সুখে-দুঃখে একে অন্যের সাহায্য-সহযোগিতা করার সুযোগ হয়। ইমামের পেছনে সব ধরনের হিংসা-বিদ্রোহ ভুলে গিয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মুসলিগণ সালাত আদায় করে থাকে। ফলে সকলের মধ্যে সম্প্রীতি, ভালোবাসা ও ভ্রাতৃভ্রোধ গড়ে উঠে। মুসলিম ঐক্য আরও সুদৃঢ় হয়। সপ্তাহে একবার মিলিত হওয়া ও নেতার আদেশ-নিয়ে শুনে, তা মেনে চলার এক অনুপম আদর্শ প্রকাশিত হয় জুমার সালাতে। গোসলের মাধ্যমে পবিত্রতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া, যথাসম্ভব পরিষ্কার কাপড় পরিধান করা ও প্রথম কাতারে বসার মানসিকতা বৃদ্ধি পায়। মন প্রফুল্ল থাকে।

দলীয় কাজ : জুমুআর সালাত আদায়ের পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিতে আলোচনা করবে।

পাঠ ৩

ঈদের সালাত

ঈদ আরবি শব্দ। এর অর্থ আনন্দ, উৎসব ইত্যাদি। ঈদের দিন হলো মুসলমানদের মহামিলন ও জাতীয় খুশির দিন। এ প্রসঙ্গে মহানবি (স.) বলেছেন, ‘প্রত্যেক জাতিরই উৎসবের দিন আছে। আর আমাদের উৎসব হলো ঈদ।’ (বুখারি ও মুসলিম)

বছরে দুটি ঈদ। ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আয়হা। ঈদের দিন এলাকার মুসলিগণ একত্রে ঈদগাহে যান এবং দুই রাকআত ঈদের সালাত আদায় করে আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জানান।

ঈদুল ফিতর (عِيدُ الْفِطْرِ)

ঈদ মানে আনন্দ। আর ফিতর অর্থ সাওয়া বা রোয়া ভজা করা। ঈদুল ফিতর অর্থ সাওয়া ভজের আনন্দ। সুনীর্ঘ একটি মাস আল্লাহর নির্দেশ মতো রোয়া পালনের পর বিশ্ব মুসলিম সম্প্রদায় এদিনে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসে আনন্দ-উৎসব করে বলে একে ঈদুল ফিতর বলা হয়। রম্যানের পর শাওয়াল মাসের প্রথম দিন মুসলমানগণ এ উৎসব পালন করে। আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের উপর রম্যান মাসে যে ইবাদত নির্ধারিত করে দিয়েছেন, তা পালন করার তাওফিক দান করায় মুসলমানগণ আল্লাহর দরবারে এদিন শুকরিয়া জানান এবং দুই রাকআত ঈদুল ফিতরের ওয়াজিব সালাত আদায় করেন।

গুরুত্ব

ঈদের দিন আত্মীয়সজ্জন, পাড়া-প্রতিবেশী সকলের খোঁজখবর নিতে হয়। সাধ্যমতো তাদের বাসায় মিষ্টান্ন খাদ্য যেমন : পিঠা, পায়েস, সেমাই ইত্যাদি খাবার পাঠাতে হয়। ধনী, গরিব, মিসকিন সকলের সাথে ঈদের আনন্দ উপভোগ করতে হয়। এতে সকলের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। ঈদ আসে আনন্দের বার্তা নিয়ে, আসে সীমাহীন প্রীতি, ভালোবাসা ও কল্যাণের সংবাদ নিয়ে। সেই ঈদকে যথাযথ মর্যাদায় উদ্যাপন করা মুসলমানদের অবশ্য কর্তব্য।

ঈদুল ফিতরের দিন দুটি কাজ ওয়াজিব : ১. ফিতরা দেওয়া ২. ঈদের দুই রাকআত সালাত ছয় তাকবিরের সাথে আদায় করা।

ঈদের দিনে সুন্নত কাজ

১. গোসল করা।
২. সুগন্ধি ব্যবহার করা।
৩. পরিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরা।
৪. সালাত আদায়ের পূর্বে মিষ্টি জাতীয় খাদ্য খাওয়া।
৫. ময়দানে গিয়ে ঈদের সালাত আদায় করা।
৬. ঈদগাহে যাওয়ার সময় তাকবির বলতে বলতে যাওয়া।
৭. এক রাস্তায় ঈদগাহে যাওয়া এবং অন্য রাস্তায় ফিরে আসা।

ঈদের তাকবির

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ إِلَهٌ لَا إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُو لَهُ الْحَمْدُ

উচ্চারণ : আল্লাহ আকবার আল্লাহ আকবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহ আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ।

ঈদের সামাজিক শিক্ষা : বছরে দুই দিন মহান আল্লাহ মানুষের জন্য সমিলনের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এর মাধ্যমে তারা হিংসা-বিদ্রোহ, তেদাভেদ ইত্যাদি ভুলে গিয়ে প্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। রময়ানের রোয়া পালনের মাধ্যমে মানুষের তৎক্ষণা-স্কুধার জ্ঞালা অনুভব করে গরিবদের প্রতি সহযোগিতা ও সহমর্মিতার হাত বাড়িয়ে দিতে পারে। সর্বোপরি গড়তে পারে একটি শান্তিপূর্ণ আদর্শ সমাজ।

দলীয় কাজ : শিক্ষার্থীরা ঈদুল ফিতর দিনের ওয়াজিব ও সুন্নত কাজগুলোর চার্ট তৈরি করে পোস্টার পেপারে লিখবে।

বাড়ির কাজ : ঈদুল ফিতরের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

ঈদুল আযহা (عِيْدُ الْأَضْحَى)

‘ঈদুল আযহা’ শব্দময় আরবি। প্রচলিত ভাষায় বলা হয় কুরবানির ঈদ। বিশ্ব মুসলিম জাতি ত্যাগের নির্দর্শন স্বরূপ মহাসমারোহে পশু যবেহ করার মাধ্যমে জিলহজ মাসের দশম তারিখ মে উৎসব পালন করে থাকে,

তাকে ঈদুল আযহা বলে। আল্লাহর নবি হযরত ইব্রাহিম (আ.) আল্লাহর ইঙ্গিতে তাঁর প্রিয় পুত্র হযরত ইসমাইল (আ.)-কে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কুরবানি করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। পুত্র ইসমাইল (আ.) ও এটাই আল্লাহর ইচ্ছা জানতে পেরে আনন্দিত চিন্তে তা গ্রহণ করেন। আল্লাহর ইচ্ছায় ইসমাইল (আ.)-এর পরিবর্তে একটি দুশ্মা কুরবানি হয়। এ স্মৃতি রক্ষার্থে মুসলমানগণ প্রতিবছর কুরবানি করে থাকেন। কুরবানির অতুলনীয় ইতিহাস স্মরণ করে মুসলমানগণ আল্লাহর দরবারে এদিন শপথ করে বলেন, হে আল্লাহ! তোমার সন্তুষ্টির জন্য যেভাবে আমরা পশুর রক্ত প্রবাহিত করছি, তেমনিভাবে আমরা তোমার সন্তুষ্টির জন্য আমাদের জীবন উৎসর্গ করতেও সদাং প্রস্তুত আছি।

গুরুত্ব

আর্থিক সংগতিসম্পন্ন প্রত্যেক মুসলমানকে কুরবানি করতে হয়। এটা আল্লাহর বিধান। শুধু গোশত বা রক্তের নাম কুরবানি নয় বরং আল্লাহর নামে সর্বস্ব বিলিয়ে দেওয়ার এক আন্তরিক শপথের নাম কুরবানি। কুরবানির মাধ্যমে মুসলমানের ইমান ও তাকওয়ার পরীক্ষা হয়ে থাকে। আর এই তাকওয়াই হচ্ছে কুরবানির প্রাণশক্তি। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন :

لَنْ يَنْالَ اللَّهُ حُوْمَهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلِكُنْ يَنْالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ ط

অর্থ: “আল্লাহর নিকট সেগুলোর (কুরবানির পশুর) গোশত এবং রক্ত পৌছায় না বরং পৌছায় তোমাদের তাকওয়া।” (সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত ৩৭)

কুরবানির গুরুত্ব সম্পর্কে মহানবি (স.) বলেন, ‘কুরবানির রক্ত মাটিতে পড়ার আগেই তা কবুল হয়ে যায়।’ (তিরমিয়ি)। তিনি আরও বলেন, ‘কুরবানির পশুর প্রত্যেকটি পশমের জন্য একটি করে সাওয়াব পাওয়া যায়।’ (ইবনে মাজাহ)। সামর্থ্যবান ব্যক্তি কুরবানি না করলে রাসুলুল্লাহ (স.) অসন্তুষ্ট হন এবং বলেন, ‘যে ব্যক্তির সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানি না করে, সে যেন আমাদের ঈদগাহে না আসে।’ (আবু দাউদ)। আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও অশেষ পুণ্য পাওয়ার আশায় খুশি মনে কুরবানি করব।

কুরবানির গোশত বিতরণে মুস্তাহাব বিধান

কুরবানির গোশত তিন ভাগে ভাগ করে একভাগ নিজের জন্য রেখে একভাগ আত্মীয় ও প্রতিবেশীকে এবং একভাগ গরিব মিসকিনকে দিতে হয়। এতে ধনীদের সাথে গরিবরাও ঈদের আনন্দে অংশীদার হওয়ার সুযোগ পায়।

ঈদুল আযহার ওয়াজিব কাজ

১. অতিরিক্ত ছয় তাকবিরের সাথে ঈদুল আযহার দুই রাকআত সালাত আদায় করা।
২. কুরবানি করা। এছাড়া জিলহজ মাসের ৯ তারিখ ফজর হতে ১৩ তারিখ আসর পর্যন্ত প্রত্যেক ফরজ সালাতের পর তাকবিরে তাশরিক একবার বলা ওয়াজিব। জামাআতে সালাত আদায় করলে সবাই উচ্চস্বরে পড়বে আর একাকী সালাত আদায় করলে নীরবে পড়বে।

ঈদুল আযহার সন্নত ঈদুল ফিতরের মতো। কেবল পার্থক্য এই যে, ঈদুল ফিতরের দিন সালাতের আগে আর ঈদুল আযহার দিন সালাত ও কুরবানির পর কিছু খাওয়া সন্নত।

ঈদের সালাত আদায়ের নিয়ম

ঈদের দিন সূর্যোদয়ের পর থেকে দুপুরের পূর্ব পর্যন্ত ঈদের সালাত আদায় করা যায়। প্রথমে কাতার করে নিয়ত করবে। তাকবিরে তাহরিমা বলে হাত বাঁধবে। সানা পড়বে। তারপর ইমাম সাহেবের সাথে অতিরিক্ত তিনটি তাকবির বলবে। প্রত্যেক তাকবিরে কান পর্যন্ত হাত উঠবে। প্রথম দুই তাকবিরে হাত বাঁধবে না। তৃতীয় তাকবিরে অন্যান্য সালাতের ন্যায় হাত বাঁধবে। ইমাম সাহেব স্বাভাবিক নিয়মে প্রথম রাকআত শেষ করে দ্বিতীয় রাকআতের বুকুতে যাওয়ার পূর্বে অতিরিক্ত তিনটি তাকবির বলবেন। মুসল্লিরাও তাঁর সাথে তাকবির বলবে। তাকবিরে কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে ছেড়ে দেবে, হাত বাঁধবে না। চতুর্থ তাকবিরে বুকুতে যাবে। এরপর স্বাভাবিক নিয়মে সালাত শেষ করবে। সালাত শেষে ইমাম সাহেব দুটি খুতবা দেবেন। প্রত্যেক মুসল্লির খুতবা শোনা ওয়াজিব। ঈদের মাঠে যাবার পথে ঈদুল আযহার তাকবির ঈদুল ফিতরের তাকবিরের অনুরূপ। আর ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের সালাত আদায়ের পদ্ধতি একই, শুধু নিয়তের বেলায় আলাদা নিয়ত করতে হবে।

সামাজিক শিক্ষা

ঈদের দিনে আমরা ভেদাভেদ ভুলে যাব। বড়দের সম্মান ও ছোটদের সন্নেহ করব। একে অন্যের সাথে সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করে নেব, পরস্পরের সাথে সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ব গড়ে তুলব। একে অন্যের থেকে ভালোবাসার শিক্ষা গ্রহণ করব। পারস্পরিক ভালোবাসা ও সহমর্মিতায় আমাদের জীবনকে সুন্দর করে গঠন করার শিক্ষা গ্রহণ করব। সামাজিক সাম্যের শিক্ষা গ্রহণ করব।

দলীয় কাজ : ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের সালাত সমবেত ক্লাসে একজন শিক্ষার্থী আদায় করে দেখাবে, অন্যরা ভুলগুলো তাদের নিজ নিজ খাতায় লিখবে। পরে আলোচনা করবে।

পাঠ ৪

সালাতুল জানায়া (صلوةُالْجَنَازَةِ)

পরিচয়

‘সালাতুল জানায়া’ দুটিই আরবি শব্দ। প্রচলিত ভাষায় বলা হয় জানায়ার সালাত বা জানায়ার নামায। মৃত ব্যক্তিকে সামনে রেখে কবরস্থ করার পূর্বে চার তাকবিরসহ যে সালাত আদায় করা হয়, তাকে জানায়ার সালাত বলে। জানায়ার সালাত ফরজে কিফায়া। এলাকার কিছুসংখ্যক লোক এ সালাত আদায় করলে সবার পক্ষ থেকে সালাত আদায় হয়ে যায়। কেউ আদায় না করলে এলাকার সবাই গুনাহগার হয়। এ সালাতে বুকু-সিজদাহ নেই।

গুরুত্ব ও তাৎপর্য

মানুষ মরণশীল। প্রত্যেককেই একদিন মরতে হবে। মৃত ব্যক্তির প্রতি জীবিতদের অনেক কর্তব্য আছে। মৃতকে গোসল দেওয়া, কাফন পরানো, তার জানায়ার সালাত আদায় করা এবং সবশেষে তাকে কবরস্থ করা একান্ত কর্তব্য। মূলত জানায়ার সালাত হলো মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া। যত বেশি লোক একত্রিত

হয়ে দোয়া করবে ততই তা কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। তাই জানায়ার সালাতে লোকসংখ্যা যত বেশি হবে, ততই ভালো, কিন্তু লোকসংখ্যা বেশি হওয়ার জন্য জানায়া বিলম্ব করা ঠিক নয়। অধিক লোক একত্রিত করার জন্য মৃত্যুর সংবাদ চারদিকে প্রচার করা উচিত। আল্লাহর নিকট একদিন আমাদেরও ফিরে যেতে হবে, এ সালাত সে কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এ প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, ‘যে ব্যক্তি জানায়ার সালাত আদায় করবে, তার জন্য এক কিরাত (সাওয়াব) এবং যে ব্যক্তি দাফনকার্য শেষ হওয়া পর্যন্ত অবস্থান করবে, তার জন্য দুই কিরাত (সাওয়াব)। এক একটি কিরাত হলো উহুদ পাহাড় পরিমাণ।’ (তিরমিয়ি)

জানায়ার সালাত আদায়ের নিয়ম

মৃত ব্যক্তিকে গোসল করিয়ে কাফন পরানোর পর ইমাম তাকে সামনে রেখে তার বুক বরাবর দাঁড়াবেন। মুক্তাদিগণ ইমামের পেছনে দাঁড়াবে। তারপর মনে মনে নিয়ত করবে, ‘আমি কিবলামুখী হয়ে এই ইমামের পেছনে চার তাকবিরের সাথে জানায়ার সালাত ফরজে কিফায়া আদায় করছি।’

প্রথম তাকবির বলে দুই হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে হাত বাঁধবে। পরে সানা পড়ে হাত বাঁধা অবস্থাতেই ইমামের সাথে দ্বিতীয় তাকবির বলবে। তারপর দরবন শরিফ পড়ে ইমামের সাথে তৃতীয় তাকবির বলবে। তারপর নিম্নের দোয়াটি পড়বে :

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعِصَمِنَا وَمَيْتَنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا - اللَّهُمَّ مِنْ أَحْبَبِنَا إِلَيْنَا فَاحْسِنْ إِلَيْهِمْ - فَأَحْسِنْ إِلَى الْإِسْلَامِ - وَمَنْ تَوَفَّ يَوْمَ نَحْنَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ تَوَفَّ فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মাগফির লিহাইয়িনা ওয়া মায়িতিনা ওয়া শাহিদিনা ওয়া গায়িবিনা ওয়া ছাগিরিনা ওয়া কাবিরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া উনসানা। আল্লাহুম্মা মান আহয়িয়াইতাতু মিন্না ফাআহয়িহি আলাল ইসলামি ওয়ামান তাওয়াফ ফাইতাতু মিন্না ফাতাওয়াফ ফাতু আলাল ইমান।

এই দোয়া পড়ে চতুর্থ তাকবির বলে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করবে। তাকবির বলার সময় হাত উঠবে না। মৃত ব্যক্তি যদি অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক হয়, তবে তৃতীয় তাকবিরের পর নিম্নের দোয়াটি পড়বে :

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرِطًا وَاجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا وَذُخْرًا وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفِّعًا

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মাজ আলতু লানা ফারত্তাও ওয়াজআলতু লানা আজরাও ওয়া জুখরাও ওয়াজ আলতু লানা শাফিআও ওয়া মুশাফ ফাআন।

মৃত ব্যক্তি অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকা হলে পড়বে :

اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرِطًا وَاجْعَلْهَا لَنَا أَجْرًا وَذُخْرًا وَاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَمُشَفِّعَةً

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মাজআলহা লানা ফারত্তাও ওয়াজ আলহা লানা আজরাও ওয়াজুখরাও ওয়াজআলহা লানা শাফিআত্তাও ওয়া মুশাফফাআহ।

মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার সময় পড়বে :

بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ

উচ্চারণ : বিসিমিল্লাহি ওয়াআলা মিল্লাতি রাসুলিল্লাহ।

কবরের উপর মাটি দেওয়ার সময় পড়বে :

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى

উচ্চারণ: মিনহা খালাকনাকুম ওয়াফিহা নুয়িদুকুম ওয়ামিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা। (সূরা তা-হা, আয়াত ৫৫)

এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের জানায়ায় উপস্থিত হওয়া অন্যতম কর্তব্য। ভোগবিলাসে মন্ত্র উঁচু শ্রেণির মানুষ এবং সহায় সম্বলহীন দরিদ্র মানুষ উভয়কে একইভাবে সাদা কাপড়ে, খালি হাতে পরপারের যাত্রী হতে হবে – এ সালাত সে কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়। ক্ষণিকের জীবন অনাড়ম্বরভাবে কাটিয়ে ইমানসহ কবরে যাওয়ার প্রস্তুতি নেওয়া সবার একান্ত কর্তব্য।

দলীয় কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে জানায়ার সালাতের গুরুত্ব নিয়ে শ্রেণিতে আলোচনা করবে।

বাড়ির কাজ : জানায়ার সালাত আদায়ের নিয়ম বর্ণনা কর।

পাঠ ৫

সালাতুত তারাবিহ (صَلْوَةُ اللَّزِّا وِيْحَ)

রম্যান মাসে এশার সালাতের পর বিতরের পূর্বে যে সালাত আদায় করতে হয়, তাকে সালাতুত তারাবিহ বা তারাবিহের সালাত বলে। এ সালাত সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ। নবি করিম (স.) নিজে এ সালাত আদায় করেছেন ও সাহাবিগণকে আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। সুন্নত সালাত জামাআতে আদায়ের বিধান নেই। তবে তারাবিহের সালাত জামাআতে আদায় করা সুন্নত। এ সালাত ঘোট বিশ রাকআত।

তারাবিহ সালাত আদায়ের নিয়ম

রম্যান মাসে এশার ফরজ ও দুই রাকআত সুন্নতের পর বিতরের পূর্বে তারাবিহের নিয়তে দুই রাকআত করে ঘোট বিশ রাকআত সালাত আদায় করতে হয়। প্রতি চার রাকআত অন্তর বসে বিশ্রাম নিতে হয়। তখন বিভিন্ন তাসবিহ পড়া যায়। নিম্নের দোয়াটিও পড়া যায়–

**سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلْكُوتِ سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ وَالْعَظَمَةِ وَالْهَبَّةِ وَالْفُدْرَةِ وَالْكِبْرَيَاءِ وَالْجَبَرُوتِ -
سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَقِّيِّ الَّذِي لَا يَنَامُ وَلَا يَمُوتُ أَبَدًا - سُبْحَونَ قُدُّوسٍ رَبِّنَا وَرَبِّ الْمَلَكَاتِ وَالرُّوحِ -**

উচ্চারণ : সুবহানাযিল মুলকি ওয়াল মালাকুতি সুবহানাযিল ইয়াতি ওয়াল আজমাতি ওয়াল হায়বাতি ওয়াল কুদরাতি ওয়াল কিবরিয়ায়ে ওয়ালজাবুতে। সুবহানাল মালিকিল হাইয়িল্লায়ি লাইয়ানামু ওয়ালাইয়ামুতু আবাদান

আবাদা। সুব্রহ্মন কুদুসুন রাবুনা ওয়ারাবুল মালাইকাতি ওয়ার বুহু।

তারাবিহের সালাত শেষ করে বিতরের সালাত রমযান মাসে জামাআতে আদায় করার বিধান রয়েছে।

তারাবির সালাতের গুরুত্ব ও ফজিলত

পবিত্র রমযান মাস রহমতের ও বরকতের মাস। পাপ থেকে মৃত্তি পাওয়ার শ্রেষ্ঠ সময় হলো রমযান মাস। সারা দিন সাওম (রোয়া) পালনের পর বান্দা যখন ঝাউত শরীরে তারাবিহের বিশ রাকআত সালাত আদায় করে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করে, তখন আল্লাহ সে বান্দার প্রতি খুবই সন্তুষ্ট হন। বান্দার জন্য এমন সুযোগ বছরে মাত্র একবারই আসে। তাই আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে আল্লাহর রহমত পেতে ব্রতী হন। এ প্রসঙ্গে নবি করিম (স.) বলেন, ‘যে ব্যক্তি ইমানের সাথে আখিরাতে প্রতিদানের আশায় রমযানের রাতে তারাবিহের সালাত আদায় করবে, আল্লাহ তায়ালা তার সকল গুনাহ মাফ করে দেবেন।’(বুখারি)। তারাবিহের সালাত ছোট ছোট সূরার মাধ্যমে আদায় করা যায়। আবার কুরআন খতমের মাধ্যমেও আদায় করা যায়। তবে মনে রাখতে হবে যে, সূরাগুলো স্পষ্ট, ধীরস্থিত ও ছন্দের সাথে পড়তে হবে। রমযান মাসে তারাবিহের সালাত একত্রিত হয়ে জামাআতে আদায় করা উচ্চম। এতে নামাযে ভুল হওয়ার আশঙ্কা কম থাকে। পূর্ণ একটি মাস পরস্পরের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ ও মতবিনিময়ের ফলে পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা, মমত্ববোধ, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ গড়ে উঠে।

দলীয় কাজ : ‘তারাবিহের নামায জামাআতে আদায় করলে ভুল কম হয়।’ এ নিয়ে শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে আলোচনা করবে।

পাঠ ৬

সালাতুত তাহাজ্জুদ (صلوة التَّهَجُّد)

‘তাহাজ্জুদ’ আরবি শব্দ। এর অর্থ রাত জাগা, ঘুম থেকে উঠা। মধ্যরাতের পর ঘুম থেকে উঠে যে সালাত আদায় করতে হয়, তাকে তাহাজ্জুদের সালাত বলে। তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করা সুন্নত। এর গুরুত্ব অপরিসীম। নবি করিম (স.) প্রতিনিয়ত এ সালাত আদায় করতেন এবং সাহাবিগণকেও আদায়ের জন্য উৎসাহিত করতেন। মহানবি (স.)-এর উপর তাহাজ্জুদ সালাত আদায়ের জন্য বিশেষ তাগিদ ছিল। মহান আল্লাহ বলেন,

وَمِنَ الْيَلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ تَأْفِلَةً لَّكَ مُلْكٌ

অর্থ : “রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করুন। এ সালাত আপনার জন্য অতিরিক্ত।”
(সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত ৭৯)

কোনো কারণে তাহাজ্জুদের সালাত ছুটে গেলে মহানবি (স.) দুপুরের আগেই কায়া করে নিতেন।

গুরুত্ব

৯২ গভীর রাতে আরামের ঘুম ত্যাগ করে বান্দা যখন আল্লাহর নৈকট্য ও রহমত পাওয়ার আশায় তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করে, তখন আল্লাহ খুবই খুশি হন। তাহাজ্জুদ সালাতের মাধ্যমে বান্দার আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত হয়। এ

সালাত আদায়ে পুণ্যময় জীবনের পথ প্রশংসিত হয়। আল্লাহ তায়ালা এ সালাত আদায়কারীর গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

‘তারা শয্যা ত্যাগ করে, তাঁদের প্রতিপালককে আশায় ও ভয়ে ভয়ে ডাকে এবং তাঁদেরকে যে রিযিক দান করেছি তা হতে তারা ব্যয় করে। কেউই জানে না তাঁদের জন্যে নয়নভিরাম কী লুকায়িত রাখা হয়েছে, তাঁদের কৃতকার্যের পূরস্কারমূরূপ।’ (সূরা আসু সাজদাহ : ১৬, ১৭)। তাহাঙ্গুদ সালাতের গুরুত্ব সম্পর্কে মহানবি (স.) বলেন, ‘ফরজ সালাতের পর সবচেয়ে উৎকৃষ্ট হলো তাহাঙ্গুদের সালাত।’ (মুসলিম)

প্রত্যেক মুমিনের উচিত তাহাঙ্গুদের সালাত আদায়ে অভ্যস্ত হওয়া। তাহলেই আল্লাহ তার বান্দার উপর সন্তুষ্ট থাকবেন।

তাহাঙ্গুদের সময় ও আদায়ের নিয়ম

রাতের শেষার্থে তাহাঙ্গুদের সালাত আদায় করা উত্তম। এ সালাত পড়া সুন্নত।

এ সালাত দুই রাকআত করে সুন্নত সালাতের নিয়মে আদায় করতে হয়। তাহাঙ্গুদের সালাত আদায় করে কয়েকবার দরশদ পাঠ করা ভালো। এরপর বিতরের সালাত আদায় করা উত্তম।

দলীয় কাজ : ‘তাহাঙ্গুদ সালাতের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারে।’ এ নিয়ে শিক্ষার্থীরা দলে আলোচনা করবে।

পাঠ ৭

সালাতুল ইশরাক (صَلْوَةُ الْإِشْرَاقِ)

ইশরাকের সালাত সুন্নতে যায়িদা বা নফল। এ নামাযে রয়েছে অনেক ফজিলত। হাদিস শরিফে এর ফজিলত সম্পর্কে অনেক বর্ণনা এসেছে। এতে অনেক সাওয়াব পাওয়া যায়। ইশরাকের সালাত দুই রাকআত করে ৪, ৬, ৮ রাকআত পর্যন্ত পড়া যায়। ইশরাকের সালাতকে হাদিসে যুহার সালাত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

সময়

ইশরাকের সালাত ফজরের পরে আদায় করতে হয়। ফজরের সালাত আদায় করে বিছানাতে বসে কুরআন তিলাওয়াত, তাসবিহ, তাহলিল ও দরশদ পাঠের অবস্থায় থাকা এবং এ সময়ে কথাবার্তা বা কাজকর্ম না করাই উত্তম। সূর্য সম্পূর্ণরূপে উঠে গেলে এ সালাত আদায় করতে হয়। যদি কেউ ফজরের সালাতের পর দুনিয়ার কোনো আবশ্যকীয় কাজকর্ম করে এ সালাত আদায় করে, তবে তাও আদায় হবে। তবে সাওয়াব কম হবে। আমরা আল্লাহর নৈকট্য ও অধিক পুণ্য লাভের আশায় এ সালাত আদায়ে অভ্যস্ত হবো।

সালাতুল আওয়াবিন (صَلْوَةُ الْأَوَّبِينَ)

এ সালাতও সুন্নতে যায়িদা। হাদিসে আওয়াবিন সালাতের অনেক ফজিলত বর্ণিত আছে। এ সালাত নিয়মিত আদায় করলে অনেক সাওয়াব পাওয়া যায়।

সময় ও আদায়ের নিয়ম

আওয়াবিনের সালাত মাগরিবের ফরজ ও দুই রাকআত সন্নতের পর থেকে এশার ওয়াক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আদায় করা যায়। আওয়াবিনের সালাত দুই রাকআত করে ছয় রাকআত পড়তে হয়। আমরা অধিক সাওয়াবের আশায় এ সন্নত সালাত আদায়ে অভ্যস্ত হব।

দলীয় কাজ : শিক্ষার্থীরা ইশরাক ও আওয়াবিন সালাতের সময় ও রাকআত সংখ্যা ছক আকারে পোস্টারে লিখিবে এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

সালাতের নৈতিক শিক্ষা

সালাত মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বড় নিয়ামত ও কল্যাণপ্রসূ উপহার। সালাত মানুষকে সকল পাপাচার, অশ্লীলতা ও দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ভোগ-বিলাসের অন্ধমোহ থেকে মুক্ত ও পবিত্র রাখে। মহান আল্লাহ বলেন –

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفُحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

অর্থ : “নিচয়ই সালাত মানুষকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।” (সূরা আল-আনকাবুত, আয়াত ৪৫)

সালাত এক বড় নিয়ন্ত্রক শক্তি। প্রকৃত সালাত আদায়কারী মসজিদের বাইরে কোলাহল এবং দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তেও কোনো অন্যায় কাজ করতে পারে না। সালাত মূলত বান্দার প্রতিটি গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে। দুর্বল মন কখনো শয়তানের প্রলোভনে আকৃষ্ট হয়ে পড়লে বিবেক তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে কিছুক্ষণ পরেই তোমাকে মসজিদে গিয়ে মহান প্রভূর দরবারে সিজদাহ বা মাথানত অবস্থায় উপস্থিত হতে হবে।

অপকর্ম করে তুমি কীভাবে সে দরবারে উপস্থিত হবে? এ ভাবনা তার মনে প্রবল হয়ে উঠলে সে আর অন্যায় পথে পা বাঢ়াতে পারে না। শয়তানি প্রলোভন হতে রক্ষা পায় এবং পুণ্যের পথে ফিরে আসে। প্রত্যেক মুসলমান যদি দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামাআতে আদায় করে, তাহলে অবশ্যই তাদের নৈতিকতার উন্নতি হবে। সমাজের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে কোনো প্রকার ভুল-আন্তি বা অনিয়মের আশ্রয় নেবে না। বরং তারা হয়ে উঠবে এ জাতির আদর্শ মানবসম্পদ।

দলীয় কাজ : ‘সালাতের নৈতিক শিক্ষা একজন মানুষকে কর্তব্যপরায়ণ করে তোলে’।
এ বিষয়ে শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে আলোচনা করবে।

সালাতের সামাজিক শিক্ষা

জামাআতের সাথে সালাত আদায় করার সামাজিক গুরুত্ব অনেক। ইমামের পেছনে সালাত আদায়ের অর্থ নেতার অনুসরণ। জামাআতে সালাত আদায়ের ফলে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ থাকে না। রাজা-প্রজা, ধনী-গরিব, ছোট-বড়, শিক্ষিত-অশিক্ষিত একই সারিতে দাঁড়ায়। এতে মুসলমানদের মধ্যে জাতীয় ঐক্যের

প্রতিফলন ঘটে। দৈনিক পাঁচবার জামাআতে সালাত আদায় করলে পরম্পরের খোঁজখবর নেওয়া যায়, বিপদাপদে একে অপরের সাহায্য করা সম্ভব হয় এবং আত্মবোধ দৃঢ় হয়। তারা সামাজিক দায়িত্ব পালনে সর্বদা সচেষ্ট হয়। এরূপ ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্রের অত্যন্ত দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠে, তারা জাতির অমূল্য মানবসম্পদে পরিণত হয়।

দায়িত্বশীল পদে নিয়োজিত ব্যক্তিকে তার কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তোলার জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়। আর সালাতই হচ্ছে এর উন্নম প্রশিক্ষণ।

দলীয় কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে বসে পরম্পরাগত আলোচনা করে সালাতের সামাজিক শিক্ষা সম্পর্কে একটি তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ ৮

সাওম (الصَّوْمُ)

সাওমের ধারণা

‘সাওম’ আরবি শব্দ। এর অর্থ বিরত থাকা। শরিয়তের পরিভাষায় সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিয়তের সাথে পানাহার ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি থেকে বিরত থাকাকে সাওম বা রোয়া বলে। রম্যান মাসের রোয়া পালন করা মুসলমানের উপর ফরজ। যে তা অমীকার করবে সে কাফির হবে। বন্ধুত রোয়া পালনের বিধান পূর্ববর্তী সকল উচ্চতের জন্য অপরিহার্য ইবাদত ছিল। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন –

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

অর্থ: “হে ইমানদারগণ! তোমাদের উপর রোয়া ফরজ করা হলো, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী উচ্চতগণের উপর, যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।” (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১৮৩)

রোয়া পালন করলে মানুষ পরম্পরাগত সহানুভূতিশীল হয়। ধনীরা গরিবের অনাহারে, অর্ধাহারে জীবনযাপনের কষ্ট অনুধাবন করতে পারে। ফলে তারা দান-খয়রাতে উৎসাহিত হয়। রোয়া পালনের মাধ্যমে মানুষ হিংসা, বিদ্রোহ, পরানিন্দা, ধূমপানে আসন্তি ইত্যাদি বদ অভ্যাস ত্যাগ করতে পারে। হাদিসে বর্ণিত আছে –

الصِّيَامُ جُنَاحٌ

অর্থ: ‘রোয়া হচ্ছে তালস্বরূপ।’ (বুখারি)

কৃপ্যবৃত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে আত্মরক্ষার হাতিয়ার হলো রোয়া। রোয়া পালনের মাধ্যমে পানাহারে নিয়মানুবর্তিতার অভ্যাস গড়ে উঠে। এতে অনেক রোগ দূর হয়। স্বাস্থ্য ভালো থাকে। রোয়ার ফজিলত সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘রম্যান মাস, এতে মানুষের দিশারী এবং সংগঠনের স্পষ্ট নির্দেশন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরাপে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এ মাস পাবে, তারা যেন এ মাসে সিয়াম পালন করে।’ ৯

(সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১৮৫)। এতে একথা প্রতীয়মান হয় যে, রম্যান মাসে কুরআন নাজিল হয়েছে বলে এটি অতি পবিত্র মাস। হাদিসে কুদসিতে আছে-

الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجِزُّ بِهِ

অর্থ : ‘রোয়া কেবল আমারই জন্য। আমি নিজেই এর প্রতিদান দেবো।’ (বুখারি)। অন্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, ‘জান্নাতের রাইয়ান নামক একটি দরজা আছে। কিয়ামতের দিন সিয়াম পালনকারী ব্যক্তিত অন্য কেউ এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না।’ (বুখারি)। রাসুলুল্লাহ (স.) আরও বলেন, ‘যে ব্যক্তি ইমানের সাথে এবং আখিরাতে সাওয়াবের আশায় সাওম পালন করে, তার অতীত জীবনের সকল (সগিরা) গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।’ (বুখারি ও মুসলিম)। এ মাস খৈরের মাস। আর খৈরের বিনিময় হচ্ছে জান্নাত। এ মাসে মুমিনের রিয়িক বাড়িয়ে দেওয়া হয়। যে ব্যক্তি কোনো রোয়া পালনকারীকে ইফতার করাবে, সে তার রোয়ার সমান সাওয়াব পাবে। অথচ রোয়া পালনকারী ব্যক্তির সাওয়াবে বিন্দুমাত্র ঘাটতি হবে না। ফজিলাতের দিক দিয়ে রম্যান মাসকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম অংশ রহমতের, দ্বিতীয় অংশ মাগফিরাতের এবং শেষ অংশ জাহানাম হতে মুক্তি পাওয়ার।

সাওমের (রোয়ার) প্রকারভেদ

রোয়া ছয় প্রকার। ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত, মুস্তাহাব, নফল ও মাকরহ।

- ক. ফরজ রোয়া: বছরে শুধু রম্যান মাসের রোয়া পালন করা ফরজ এবং এর অব্যাকারকারী কাফির। রম্যানের রোয়ার কায়াও ফরজ। বিনা ওয়ারে এ রোয়া ত্যাগকারী ফাসিক ও গুনাহগার হবে।
- খ. ওয়াজিব রোয়া: কোনো কারণে রোয়া পালনের মানত করলে তা পালন করা ওয়াজিব। কোনো নির্দিষ্ট দিনে রোয়া পালনের মানত করলে সেদিনেই পালন করা জরুরি।
- গ. সুন্নত রোয়া: রাসুলুল্লাহ (স.) যে সকল রোয়া নিজে পালন করেছেন এবং অন্যদের পালন করতে উৎসাহিত করেছেন, সেগুলো সুন্নত রোয়া। আশুরা ও আরাফার দিনে রোয়া পালন করা সুন্নত।
- ঘ. মুস্তাহাব রোয়া: চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের রোয়া পালন করা মুস্তাহাব। সম্ভাবের প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার এবং শাওয়াল মাসের ছয়টি রোয়া পালন করা মুস্তাহাব।
- ঙ. নফল রোয়া: ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত ও মুস্তাহাব ছাড়া সকল প্রকার রোয়া নফল। যে সকল দিনে রোয়া পালন করা মাকরহ ও হারাম, এই সকল দিন ব্যক্তিত অন্য যেকোনো দিন রোয়া রাখা নফল।
- চ. মাকরহ রোয়া: ১. মাকরহ তাত্ত্বিক, যা কার্যত হারাম। যথা- দুই ঈদের দিনে ও জিলহজ মাসের চাঁদে ১১, ১২, ১৩ তারিখে রোয়া পালন করা। ২. মাকরহ তানযিহি, যেমন- মুহাররাম মাসের ৯ বা ১১ তারিখে রোয়া পালন না করে শুধু ১০ তারিখে পালন করা।

দলীয় কাজ : শিক্ষার্থীরা সাওমের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা ছক আকারে লিখে প্রেরণে প্রদর্শন করবে।

পাঠ ৯

সাহারি (السّحْرِ)

‘সাহারি’ আরবি শব্দ। যা সাহারন শব্দ থেকে উৎপন্নি লাভ করেছে। এর অর্থ ভোর, প্রভাত ইত্যাদি। রময়ান মাসে রোয়া পালনের উদ্দেশ্যে সুবহে সাদিকের পূর্বে যে খাওয়া হয়, তাকে সাহারি বলে। সাহারি খাওয়া সুন্নত। রাসুলুল্লাহ (স.) নিজে সাহারি খেয়েছেন এবং অন্যদেরও খাওয়ার জন্য তাগিদ করতেন। মহানবি (স.) বলেছেন, ‘সাহারি খাওয়া বরকতের কাজ। তোমরা সাহারি খাও।’ (বুখারি)। সুবহে সাদিকের আগেই সাহারি খাওয়া শেষ করতে হবে। কিন্তু এত আগে সাহারি খাওয়া উচিত নয় যে, খাওয়ার পর অনেক সময় বাকি থাকে। ফলে অনেকে বিশ্বামের জন্য বিছানায় ঘোর এবং ঘুমিয়ে পড়ে। এতে সালাত কায়া হয়ে যায়।

ইফতার (الإفطار)

‘ইফতার’ আরবি শব্দ। এর অর্থ ভজ্ঞ করা। ইসলামি পরিভাষায় সূর্যাস্তের পর নিয়তের সাথে হালাল বস্তু পানাহারের মাধ্যমে রোয়া ভজ্ঞ করাকে ইফতার বলে। ইফতার করা সুন্নত। এতে অনেক সাওয়াব পাওয়া যায়। ইফতার করার সময় ‘বিস্মিল্লাহ’ বলে শুরু করা এবং ‘আলহামদুল্লাহ’ বলে শেষ করা উত্তম। তবে নিয়ন্ত্রণ দোয়াটিও পড়া যায় :

أَللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رَزْقِكَ أَفْتَرْتُ -

অর্থ: ‘হে আল্লাহ! আপনার জন্য সাওম পালন করেছি, আপনার উপরই নির্ভর করছি এবং আপনার দেওয়া রিয়িক দ্বারাই ইফতার করলাম।’ (আবু দাউদ)। নিজে ইফতার করার সাথে সাথে অন্যকেও ইফতার করালে অনেক সাওয়াব পাওয়া যায়। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, ‘যে ব্যক্তি কোনো রোয়াদারকে ইফতার করাবে, সে রোয়াদারের সমান সাওয়াব পাবে।’ (তিরমিয়ি)। আমরা অধিক সাওয়াব ও আল্লাহর রহমত পাওয়ার আশায় নিজে ইফতার করব এবং অন্যকেও ইফতার করাব।

সাওম ভজ্ঞের কারণ

যেসব কারণে সাওম ভজ্ঞ হয় এবং একটির পরিবর্তে একটি সাওম পালন করা ফরজ হয়, তা নিম্নে বর্ণনা করা হলো :

১. ভুলবশত কিছু খেয়ে ফেলার পর সাওম ভজ্ঞ হয়েছে মনে করে ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করলে।
২. কুলি করার সময় অনিচ্ছায় পানি পেটে গেলে।
৩. সাওম পালনকারীকে জোর করে কেউ কিছু পানাহার করালে।
৪. ভুলবশত রাত এখনো বাকি আছে মনে করে সুবহে সাদিকের পর সাহারি খেলে।
৫. ইফতারের সময় হয়েছে মনে করে সূর্যাস্তের আগে ইফতার করলে।

৬. ইচ্ছাকৃতভাবে মুখ ভর্তি বমি করলে ।

৭. প্রশ্নাব-পায়খানার রাস্তার মাধ্যমে ওষুধ বা অন্য কিছু গ্রহণ করলে ।

সাওম মাকরহ হওয়ার কারণ

সাওম মাকরহ হওয়ার বিভিন্ন কারণ রয়েছে। নিম্নে কতিপয় কারণ উল্লেখ করা হলো-

১. অন্যের গিবত অর্থাৎ দোষক্রটি বর্ণনা করলে ।

২. মিথ্যা কথা বললে, অশ্লীল আচরণ বা গালমন্দ করলে ।

৩. কুলি করার সময় গড়গড়া করলে । কারণ এতে গলার ভিতর পানি চুকে গিয়ে রোয়া ভঙ্গের আশঙ্কা থাকে ।

৪. যথাসময়ে ইফতার না করলে ।

৫. গরমরোধে গায়ে ঠাণ্ডা কাপড় জড়িয়ে রাখলে বা বারবার কুলি করলে ।

দলীয় কাজ : শিক্ষার্থীরা সাহারি ও ইফতারের সময়সূচি ও দোয়া ছক আকারে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে ।

সাওমের (রোয়ার) কায়া ও কাফ্ফারা (حُنْكَارْ كَفَّارَ) (قَضَاءُ الصَّوْمِ وَ كَفَّارَةُ إِفْرَادِ الصَّوْمِ)

কায়া

কোনো কারণে অনিচ্ছায় যদি সাওম ভেঙে যায় কিংবা কোনো ওয়রে তা পালন করা না হয়, তবে একটি সাওমের পরিবর্তে একটি সাওমই রাখতে হয়। একে কায়া সাওম বলে ।

সাওম কায়া করার কারণসমূহ

১. সাওম পালনকারী রম্যান ঘাসে অসুস্থ হয়ে পড়লে বা সফরে থাকলে অথবা অন্য কোনো ওয়রের কারণে সাওম পালনে অপারগ হলে ।

২. রাত মনে করে তোরে পানাহার করলে । সম্ম্যাহ হয়ে গেছে মনে করে সূর্যাস্তের পূর্বে ইফতার করলে ।

৩. ইচ্ছাকৃতভাবে মুখভর্তি বমি করলে ।

৪. জোরপূর্বক সাওম পালনকারীকে কেউ পানাহার করালে ।

৫. কুলি করার সময় অনিচ্ছায় পানি পেটে গেলে ।

৬. ভুলক্রমে কোনো কিছু খেতে শুরু করার পর সাওম নষ্ট হয়ে গেছে মনে করে পুনরায় খেলে ।

৭. দাঁত হতে ছোলা পরিমাণ কোনো জিনিস বের করে খেলে ।

উল্লিখিত অবস্থায় সাওম নষ্ট হলেও সারা দিন না খেয়ে থাকতে হয় এবং পরে কায়া করতে হয় ।

কাফ্ফারা (كَفَّارَة)

ইচ্ছাকৃতভাবে সাওম পালন না করলে বা সাওম রেখে বিনা কারণে ভেঙে ফেললে কায়া এবং কাফ্ফারা উভয়ই ফরজ হবে ।

সাওমের কাফ্ফারা নিম্নরূপ:

১. একাধারে দুই মাস সাওম পালন করা ।

২. এতে অক্ষম হলে ৬০ জন মিসকিনকে পরিত্রক্ষির সাথে দুই বেলা খাওয়ানো অথবা

৩. একজন দাসকে স্বাধীনতা প্রদান করা ।

একাধারে দুই মাস কাফ্ফারার সাওম আদায়কালীন যদি মাসে দুই-একদিন বাদ পড়ে যায়, তবে পূর্বের সাওম বাতিল হয়ে যাবে । পুনরায় নতুন করে শুরু করে দুই মাস বিরতিহীনভাবে সাওম পালন করতে হবে ।

দলীয় কাজ : শিক্ষার্থীরা সাওম কায়া ও কাফ্ফারার কারণ পৃথকভাবে পোস্টার পেপারে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে ।

পাঠ ১০ ইতিকাফ (إِتِكَافُ)

‘ইতিকাফ’ আরবি শব্দ । এর অর্থ অবস্থান করা, আটকে থাকা । শরিয়তের পরিভাষায় সাংসারিক কাজকর্ম ও পরিবার থেকে আলাদা হয়ে মসজিদে ইবাদতের নিয়তে অবস্থান করাকে ইতিকাফ বলা হয় ।

ইতিকাফ সুন্নতে মুয়াকাদা কিফায়া । এলাকাবাসীর মধ্য থেকে একজন আদায় করলেই আদায় হয়ে যাবে । আর কেউ আদায় না করলে সকলেই দায়ি হবে । ইতিকাফকারী দুনিয়ার কাজকর্ম থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হয় । ফলে সে অনর্থক কথাবার্তা ও ঘৰতীয় পাপ থেকে বেঁচে থাকে । আল্লাহর সাথে মনের সম্পর্ক দৃঢ় হয় । একাগ্রচিত্তে কয়েক দিন ইবাদতের ফলে তার মনে আল্লাহর ভীতি গভীরভাবে সৃষ্টি হয় । ফলে দুনিয়ার চাকচিক্য তাকে আল্লাহর যিকর (স্মরণ) হতে দূরে সরাতে পারে না । ইবাদতে তার মনে শান্তি আসে । ইতিকাফের ফজিলত অনেক । রাসূলুল্লাহ (স.) নিয়মিতভাবে প্রতিবছর ইতিকাফ করতেন । হাদিসে আছে, ‘রাসূলুল্লাহ (স.) প্রতি রমযানের শেষ দশ দিন ইতিকাফ করতেন । এ আমল তাঁর ইত্তিকাল পর্যন্ত বহাল ছিল । মহানবি (স.)-এর মৃত্যুর পর তাঁর বিবিগণণ এ নিয়ম পালন করেন ।’ (বুখারি)

রমযান মাসে লাইলাতুল কদর নামে একটি বরকতময় রাত আছে । যে রাত হাজার মাস অপেক্ষাও উভয় । রমযানের শেষ দশ দিনের বিজোড় রাতে অর্থাৎ ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯ তারিখে লাইলাতুল কদর খুঁজতে মহানবি (স.) নির্দেশ দিয়েছেন । এ সময় ইতিকাফ অবস্থায় থাকলে লাইলাতুল কদর লাভের সৌভাগ্য হতে পারে ।

আদায়ের নিয়ম

রম্যানের শেষ দশ দিনে ইতিকাফ করা সুন্নত। এর সর্বনিম্ন সময় একদিন একরাত। রম্যান মাস ছাড়াও মুস্তাহাব ইতিকাফ যেকোনো সময় পালন করা যায়। স্ত্রীলোক নিজ ঘরে নির্দিষ্ট স্থানে ইতিকাফ করতে পারেন।

দলীয় কাজ : ‘ইতিকাফের মাধ্যমে লাইলাতুল কদর পাওয়া সম্ভব।’ দলে বিভক্ত হয়ে এ নিয়ে আলোচনার আয়োজন করবে।

সাদাকাতুল ফিতর (صَلَقَةُ الْفِطْرِ)

ঈদুল ফিতরের দিন ঈদের সালাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে সাওমের ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন ও আল্লাহর সম্মতি লাভের উদ্দেশ্যে গরিব-দুঃখীদের সহযোগিতায় যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সম্পদ দান করা হয়, তাকে সাদাকাতুল ফিতর বলে।

মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত নিসাব পরিমাণ (সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান ভরি রৌপ্য বা সম্পরিমাণ অর্থ প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাকলে তাকে নিসাব বলে) সম্পদের মালিক প্রত্যেক স্বাধীন মুসলিম নর নারীর উপর ‘সাদাকাতুল ফিতর’ ওয়াজিব। শিশু ও পরাধীন (গোলাম) ব্যক্তির সাদাকা অভিভাবক আদায় করবে।

তাংগ্রে

যে বছর রোয়া ফরজ হয়, সে বছরই রাসুলুল্লাহ (স.) মুসলমানদের সাদাকায়ে ফিতর আদায় করার নির্দেশ দেন। মুসলমানগণ পরিত্র রম্যান মাসে রোয়া পালন করে। আল্লাহ তায়ালার ইবাদতে মশগুল থাকে। এসব দায়িত্ব পালনে অনেক সময় ভুলভাস্তি হয়ে যায়। রোয়া পালনে যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়, তার ক্ষতিপূরণের জন্য শরিয়তে রম্যানের শেষে ‘সাদাকাতুল ফিতর’ ওয়াজিব করে দেওয়া হয়েছে। ফিতর পেলে গরিব-অনাথ লোকেরাও ঈদের খুশিতে অংশীদার হতে পারে। এভাবেই ধনী-গরিবের মধ্যে ব্যবধান কমে আসে এবং সম্পূর্ণ ও সৌহার্দ গড়ে ওঠে। হাদিসে আছে, ‘সাদাকাতুল ফিতর’ দ্বারা সাওম পালনের সকল দোষক্রটি দূরীভূত হয়, গরিবের পানাহারের ব্যবস্থা হয়।’ (আবু দাউদ)।

আদায়ের নিয়ম

ঈদের সালাতের পূর্বে নিসাব পরিমাণ মালের মালিকের সাদাকাতুল ফিতর আদায় করতে হয়। ঈদের দুই-একদিন আগে ‘সাদাকাতুল ফিতর’ আদায় করা যায়। তবে ঈদের সালাতের উদ্দেশ্যে ঈদের মাঠে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে ‘সাদাকাতুল ফিতর’ আদায় করা উক্তম। ঈদের পর কেউ যদি তা আদায় করে তবে আদায় হবে কিন্তু সাওয়াব কম হবে।

সাদাকাতুল ফিতরের পরিমাণ

মাথাপিছু নিসফু সা অর্থাত্ প্রায় পৌনে দুই কেজি গম বা যব বা তার মূল্য আদায় করতে হবে।

দলীয় কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে ‘সাদাকাতুল ফিতর’ আদায়ের গুরুত্বের উপর আলোচনা করবে।

পাঠ ১১

সাওমের (রোয়ার) নৈতিক শিক্ষা

সাওম (রোয়া) পালনের মাধ্যমে বান্দা একদিকে আল্লাহর নির্দেশ পালন করে, অপরদিকে তার নৈতিকতারও বিশেষ উন্নয়ন ঘটায়। সাওমের অনেক নৈতিক শিক্ষার মধ্যে কতিপয় শিক্ষা নিম্নে তুলে ধরা হলো :

১. সংযম

মানুষের মধ্যে যেমন ভালো গুণ থাকে, তেমনি তার মধ্যে জৈবিক ও পাশবিক শক্তি ও থাকে। পাশবিক শক্তি তাকে স্বেচ্ছাচারিতার পথে পরিচালিত করে। স্বেচ্ছাচারিতার কারণে সমাজে অনাচার, কোন্দল, কলহ ও অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষের স্বীয় প্রবৃত্তিকে সংযমের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণে রাখা প্রয়োজন। রোয়া মানুষকে এই সংযম শিক্ষা দেয়। মানুষের কুপ্রবৃত্তি তাকে তার খেয়ালখুশি মতো চলতে এবং সকল প্রকার অন্যায় কাজ করতে উদ্ধৃত করে। রমযানের সাওম এই অবাধ স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতাকে নিয়ন্ত্রণ করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বৈধ পানাহার ও অন্যান্য জৈবিক চাহিদা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকার শিক্ষা দেয়। এই সাওম চরম খাদ্যবিলাসী ও স্বেচ্ছাচারিতাকে সংযমী করে তোলে। পূর্ণ এক মাস এই সংযম মেনে চলার প্রশিক্ষণ তাকে গোটা বছর সংযমী হয়ে চলতে সাহায্য করে।

দলীয় কাজ : ‘মানুষের কুপ্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণে রোয়ার সংযম শিক্ষা বিশেষ ভূমিকা রাখে।’ শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে পক্ষে বিপক্ষে আলোচনা করবে।

২. সহমর্মিতা

যে ব্যক্তি কখনো অনাহারে থাকেনি, সে কীভাবে ক্ষুধার জ্বালা অনুভব করবে? আর যে কখনো রোগাক্রান্ত হয়নি, সে কীভাবে রোগযন্ত্রণা অনুভব করবে? কোনো অভুক্ত পিপাসার্ত ভিক্ষুক বিন্দুশালীদের দ্বারে উপস্থিত হয়ে যেন বিন্দুপের শিকার না হয় - এটা রোয়ার অন্যতম শিক্ষা (অর্থাৎ অসহায় ক্ষুধার্তের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়াও সাওমের শিক্ষা)। ধর্মী-গরিব, রাজা-প্রজা, সকল মুমিন বান্দা সুবহে সাদিক থেকে সুর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার থেকে বিরত থাকার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুধার জ্বালা বুঝতে পারে। গ্রীষ্মকালে দিন বড় হয়, আবহাওয়া প্রচণ্ড গরম থাকে, তখন ধনীর দুলাল হোক আর গরিবের সন্তান হোক ক্ষুধার জ্বালা ও পিপাসার কাতরতা সম্ভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। একইভাবে রোয়াদার ব্যক্তিকে দ্বারে যখনই কোনো অনাহারী অভুক্ত মানুষ আসবে, তখন অবশ্যই তার মনে দয়া বা সহমর্মিতা সৃষ্টি হবে। ধনী ও গরিবের মধ্যে আভরিকতা, সহমর্মিতা, সহিষ্ণুতা সাওম পালনের মাধ্যমে যতটা বৃদ্ধি পায়, অন্য কোনো ইবাদতের মাধ্যমে এগুলো এত বেশি সৃষ্টি হয় না।

এই উপলব্ধির বাস্তবতা পরীক্ষার জন্য রোয়াদার ব্যক্তিকে ইফতার করানোর উপর গুরুত্বারূপ করা হয়েছে। একজন রোয়াদার অপরকে ইফতার করানোর মানেই হচ্ছে সহমর্মিতা ও আভরিকতার বহিপ্রকাশ।

বাড়ির কাজ : ‘গরিবের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে সাওমের সহমর্মিতা শিক্ষা বিশেষ ভূমিকা রাখে’ ব্যাখ্যা কর।

৩. সহিষ্ণুতা

সহিষ্ণুতা বা ধৈর্য মুমিনের জন্য এক বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতিগতভাবে মানুষের অন্তর থাকে অস্থির ও চক্ষুল। যদি কোনো দ্রুব্য তার আওতার মধ্যে থাকে, তবে তা পাওয়ার জন্য মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। মনের এ অস্থিরতা নিয়ন্ত্রণে নিজ ইচ্ছামতো কাজ করলে সমাজে বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা থাকে। একমাত্র সহিষ্ণুতার মাধ্যমে মনের কু-প্রভৃতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনাই এ ধৈর্য শিক্ষার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। রোয়া পালনকারী দিনের বেলায় ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কিছু পানাহার করে না ও অন্যায় কাজ করে না। এমনকি জৈবিক চাহিদাটুকুও দমন করে রাখে। এটি ধৈর্যের এক অনুপম দৃষ্টিকোণ। কেউ যদি অভাব অন্টনের কারণে আহারাদি সংগ্রহে অপারগ হয়, তবে রোয়ার মাধ্যমে অর্জিত ধৈর্যই হতে পারে তার একমাত্র অবলম্বন। এতে একদিকে যেমন রক্ষা হয় ইমান, তেমনি অপরদিকে শান্ত হয় পরিবার ও সমাজ।

বাড়ির কাজ : ইবাদত অধ্যায়ের শিক্ষাশৰ্থীদের পরবর্তী জীবনে কীভাবে কাজে লাগবে তার একটি তালিকা তৈরি করে পোস্টার পেপারে লিখবে।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. জামাআতে সালাত আদায় ঐক্যের প্রতিফলন ঘটায়।
২. মুসাফিরের জন্য নামায আদায় করার অনুমতি আল্লাহ তায়ালার এক বিশেষ অনুগ্রহ।
৩. বুগ্ণ ব্যক্তিকে থাকা পর্যন্ত সময়ের মধ্যেই নামায আদায় করতে হবে।
৪. জিলহজ মাসের তারিখ যে উৎসব পালন করে থাকে, তাকে সেদুল আয়ত্ব বলে।
৫. তারাবিহের নামায আদায় সুন্নতে।

বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর

বাম পাশ	ডান পাশ
১. জুমার নামায	রম্যান মাসে পাওয়া যায়।
২. বেছঁশ ব্যক্তির	তাকওয়া অর্জন।
৩. লাইলাতুল কদর	মসজিদে পড়তে হয়।
৪. রোয়ার মূল উদ্দেশ্য	কায়া করতে হয়।
৫. অনিচ্ছায় রোয়া ভাঙলে	নামায কায়া করতে হয় না।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. জামাআতের সালাতে ইমামের কর্তব্য সম্পর্কে লেখ ।
২. ঈদের দিনের সুন্নত কাজগুলো কী লেখ ।
৩. রোয়ার কাফ্ফারার বর্ণনা দাও ।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. মাসবুকের সালাত বলতে কী বোঝায়? মাসবুকের সালাত আদায়ের নিয়ম লেখ ।
২. মুসাফিরের সালাতের নিয়ম লেখ ।
৩. ঝুগ্ণ ব্যক্তির সালাত আদায়ের নিয়ম লেখ ।
৪. ‘নেতৃত্বিক অর্জনে সাওমের গুরুত্ব অপরিসীম’-ব্যাখ্যা কর ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- ১। মানুষকে সংযম শিক্ষা দেয় কোন ইবাদত?
- | | |
|----------|----------|
| ক. সালাত | খ. যাকাত |
| গ. সাওম | ঘ. হজ |
- ২। ‘সাদাকাতুল ফিতর’ আদায়ের মাধ্যমে –
- i. সাওম পালনের সকল দোষক্রটি দূরীভূত হয়
 - ii. ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায়
 - iii. গরিবের পানাহারের ব্যবস্থা হয়
- নিচের কোনটি সঠিক?
- | | |
|------------|----------------|
| ক. i | খ. i ও ii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

ধনাত্য ব্যক্তি রহিম সাহেব সাহারি খেয়ে যথারীতি সাওম শুরু করলেন। দুপুরে প্রচণ্ড গরম পড়াতে ইচ্ছা করে ভাত খেয়ে নিলেন। পরবর্তীতে তিনি কায়া হিসেবে একটি রোয়া আদায় করলেন।

৩. রহিম সাহেবের কাজের মাধ্যমে লঞ্চিত হয়েছে-

ক. ফরজ খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নত ঘ. নফল

৪. উপযুক্ত কারণে রহিম সাহেবকে-

i. কায়া করতে হবে

ii. কাফ্ফারা আদায় করতে হবে

iii. একাধারে এক মাস সাওম আদায় করতে হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সূজনশীল প্রশ্ন

১। সুলতান মিয়া একজন কৃষক। সারাদিন তিনি মাঠেই কাজ করেন। নামায়ের সময় হলে খেতের পাশে কাপড় বিছিয়ে নামায আদায় করেন। জুমার দিনে মসজিদে না গিয়ে যোহরের সালাত আদায় করেন। তার প্রতিবেশী হারুন তাকে বলল, ‘জুমার নামায’ জামাআত ব্যতীত আদায় হয় না। আমি মসজিদে যাচ্ছি। তুমিও আমার সাথে চলো। তখন সুলতান বলে, ‘মসজিদ অনেক দূরে। কাজের ক্ষতি হবে বলেই খেতের পাশে যোহর নামায আদায় করছি।’

ক. ‘জুমার সালাত’ কোনদিন আদায় করতে হয়?

খ. মুসাফির বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর।

গ. জুমার নামাযের ব্যাপারে সুলতান মিয়ার মনোভাবে কী প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. হারুন মিয়ার বন্ধুবের যৌক্তিকতা প্রমাণ কর।

২। আসলাম ও আসগর সম্মত শ্রেণির মেধাবী ছাত্র। ২য় সাময়িক পরীক্ষার সময় রময়ান মাস থাকায় পরীক্ষা খারাপ হওয়ার কথা ভেবে আসলাম রোয়া ছেড়ে দেয়। মাঝেমধ্যে সালাত আদায়েও সে গাফলতি করে। অন্যদিকে কষ্টকর হলেও আসগর নিয়মিত রোয়া পালন করে। পড়ালেখার ফাঁকে ফাঁকে ওয়াক্ত হলেই নামায আদায় করে নেয়। পিতার সাথে মাঝে মাঝে তাহাঙ্গুদের নামাযও আদায় শেষে ভালো ফলাফলের জন্য আল্লাহর সাহায্য কামনা করে। আসগর আসলামকে নিয়মিত সালাত ও সাওম পালনের ব্যাপারে বললে

ফর্মা নং-৭ (ইসলাম ও মৈত্রিক শিক্ষা, ৭ম শ্রেণি)

আসলাম বলে, এই মুহূর্তে পরীক্ষায় ভালো ফলাফলই আমার নিকট মুখ্য। পরবর্তীতে আসগর তাঁদের ধর্মীয় শিক্ষককে আসলামের বন্ধব্যটি জানালে তিনি বললেন, ‘আসলাম তোমার কথা দ্বারা ইবাদতের প্রতি অবজ্ঞা বুঝাচ্ছে যা ইবাদতকে অস্বীকার করারই শামিল।’

ক. ধৈর্যের বিনিময় কী?

খ. সাদাকাতুল ফিতর বলতে কী বোঝায়?

গ. আসলামের মনোভাবে কী প্রকাশ পেয়েছে? শরিয়তের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. আসগরের কাজের পরকালীন পরিণতি কুরআন-হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

তৃতীয় অধ্যায়

কুরআন ও হাদিস শিক্ষা

আল-কুরআন আল্লাহ তায়ালার পবিত্র বাণী। এটি মানবজাতির জন্য একটি বিশেষ নিয়ামত। মানুষকে সত্য ও সুন্দরের পথ দেখানোর জন্য আল্লাহ তায়ালা এটি মহানবি হ্যামদ (স.)-এর উপর নাজিল করেছেন। আর নবি করিম (স.) আমাদের নিকট এ পবিত্র বাণী পৌছে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালার আদেশ-নিমেধ নিজে আমল করে তিনি আমাদের হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়েছেন। সাথে সাথে তিনি মানুষের নিকট এ বাণীর মর্ম ও তাৎপর্যও ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (স.)-এর এ সমস্ত বাণী ও কর্মকে বলা হয় হাদিস। হাদিস আল-কুরআনের ব্যাখ্যাবৰূপ। ইসলামি বিধি-বিধান পূর্ণরূপে পালন করার জন্য আল-কুরআন ও হাদিসের জ্ঞানলাভ করা আবশ্যিক।

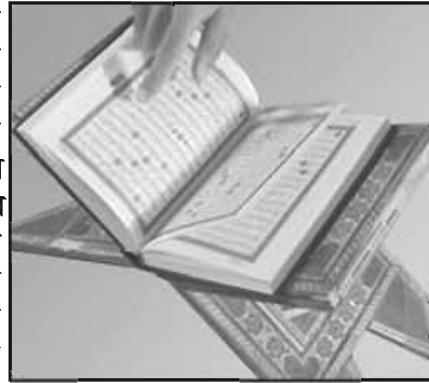
এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- আল-কুরআনের পরিচয় ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আল-কুরআনের অবতরণ, সংরক্ষণ ও সংকলন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব।
- মাদ ও ওয়াক্ফসহ তাজবিদ অনুযায়ী বিশুদ্ধভাবে কুরআন পাঠ করতে পারব।
- আল-কুরআনের নির্বাচিত পাঁচটি সূরা অর্থসহ মুখ্য বলতে ও মূল বক্তব্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- নির্বাচিত সূরাগুলোর পটভূমি (শামে নৃযুল) ও শিক্ষা বর্ণনা করতে পারব।
- মুনাজাতমূলক (প্রার্থনামূলক) তিনটি আয়াত অর্থসহ বলতে পারব।
- হাদিসের গুরুত্ব ও সিহাহ সিন্তার পরিচয় বর্ণনা করতে পারব।
- কুরআন ও হাদিসের শিক্ষা অনুযায়ী নেতৃত্ব জীবন্যাপনের উপায় চিহ্নিত করতে পারব।
- মুনাজাতমূলক তিনটি হাদিস অর্থসহ বলতে পারব।
- নেতৃত্ব গুণাবলিবিষয়ক তিনটি হাদিস অর্থসহ বলতে পারব।
- হাদিসের আলোকে মানবপ্রেম ও পরমতসহিষ্ণুতার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- হাদিসের আলোকে মানবপ্রেম ও পরমতসহিষ্ণুতামূলক আচরণগুলো চিহ্নিত করতে পারব।

পাঠ ১

কুরআন মজিদ

আল-কুরআন আল্লাহ তায়ালার পবিত্র বাণী। এটি মুসলিমগণের ধর্মস্থল। কুরআন মজিদ বরকতময় ইহ। মানুষের প্রতি এটি আল্লাহ তায়ালার একটি বিশেষ নিয়ামত। আল্লাহ তায়ালা মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর উপর সুদীর্ঘ ২৩ বছরে এটি নাজিল করেন। আসমানি কিতাবসমূহের মধ্যে এটি সর্বশেষে নাজিল করা হয়েছে। এরপর আর কোনো কিতাব আসেনি। আর ভবিষ্যতেও আসবে না। কিয়ামত পর্যন্ত এ কিতাবের বিধি-বিধান ও শিক্ষা বলবৎ থাকবে। এটি সর্বকালের সকল মানুষের জন্য হিদায়াতের উৎসস্বরূপ। আল-কুরআনের নির্দেশনা মেনে চললে মানুষ দুনিয়াতে শান্তি ও সমান পাবে। আর আখিরাতে চিরশান্তির জাগ্নাত লাভ করবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—



وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبِّرٌ كَفَّا تَبِعُوهُ وَاتَّقُوا الْعَلَّامُونَ ৪

অর্থ : “এই কিতাব আমি নাজিল করেছি, যা কল্যাণময়। অতএব, তোমরা এর অনুসরণ কর এবং সাবধান হও, হয়তো তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হবে।” (সূরা আল-আন’আম, আয়াত ১৫৫)

অবতরণ

আল্লাহ তায়ালা আল-কুরআন আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর উপর নাজিল করেন। আল-কুরআন ‘লাওহি মাহফুয়’ বা সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ আছে। ‘লাওহি মাহফুয়’ অর্থ সংরক্ষিত ফলক। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّكْيَدٌ لِّئَلَّوْحٍ مَّخْفُوظٍ

অর্থ : “বস্তুত এটি সমানিত কুরআন। সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ।” (সূরা আল-বুরুজ, আয়াত ২১-২২)

লাওহি মাহফুয় থেকে আল-কুরআন প্রথমে কদরের রাতে প্রথম আসমানের ‘বায়তুল ইয়্যাহ’ নামক স্থানে একসাথে অবতীর্ণ হয়। এটি ছিল রময়ান মাসের লাইলাতুল কদর বা মহিমান্বিত রাত। আমরা এ রাতকে শবে কদরও বলে থাকি। এরপর প্রথম আসমান থেকে অল্প অল্প করে পুরো কুরআন মজিদ প্রিয় নবি (স.)-এর উপর নাজিল করা হয়।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি। তিনি আরব দেশের মক্কা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের সময় গোটা আরব ছিল অজ্ঞতা ও বর্বরতায় আচ্ছন্ন। তারা নানা মূর্তির পূজা করত। নানারূপ অন্যায় ও অশ্লীল কাজ করত। ঐতিহাসিকগণ সে সময়কে ‘আইয়ামে জাহেলিয়া’ নামে আখ্যায়িত করেছেন। আইয়ামে জাহেলিয়া অর্থ অজ্ঞতার যুগ।

নবি করিম (স.) আরবদের এরূপ অজ্ঞতা ও বর্বরতা পছন্দ করতেন না। তিনি সবসময় সত্য ও সুন্দরের অনুসন্ধান করতেন। এজন্য তিনি হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকতেন। হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন অবস্থাতেই তাঁর নিকট সর্বপ্রথম কুরআনের বাণী নাজিল হয়। তিনি সত্যের সন্ধান পান। তখন তাঁর বয়স ছিল চল্লিশ বছর। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে শেষ নবি ও রাসূল হিসেবে মনোনীত করেন। এ সময় মহান আল্লাহর নির্দেশে হযরত জিবরাইল (আ.) সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত নিয়ে তাঁর নিকট আগমন করেন। এটিই ছিল সর্বপ্রথম ওহি। এরপর মহানবি (স.) আরও ২৩ বছর জীবিত ছিলেন। তাঁর জীবদ্ধায় আল্লাহ তায়ালা প্রয়োজন অনুসারে আল-কুরআনের বিভিন্ন অংশ অল্প অল্প করে নাজিল করেন। এভাবে সুনীর্ধ ২৩ বছরে আল-কুরআন সম্পূর্ণ অবতীর্ণ হয়।

আল-কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব

আল-কুরআন মহান আল্লাহর বাণী। এটি সংরক্ষণ করার দায়িত্বও তাঁরই। তিনি স্বয়ং আল-কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

إِنَّ عَلَيْنَا جَعْدَهُ وَقُرْآنَهُ

অর্থ : “নিশ্চয়ই এর (আল-কুরআন) সংরক্ষণ ও পাঠ করানোর দায়িত্ব আমারই।” (সূরা আল-কিয়ামাহ, আয়াত ১৭)

আল্লাহ আরও বলেন-

إِنَّمَا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْكِتَابَ كَوْاَلَةً لِحِفْظِهِ

অর্থ : “নিশ্চয়ই আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং অবশ্য আমিই এর সংরক্ষক।” (সূরা আল-হিজর, আয়াত ৯)

আল-কুরআনের সংরক্ষক স্বয়ং মহান আল্লাহ। এজন্য আজ পর্যন্ত এটির কোনোরূপ পরিবর্তন হয়নি। আর ভবিষ্যতেও হবে না। এটি সকল প্রকার পরিবর্তন হতে মুক্ত। কেউ এতে নতুন কোনো কিছু সংযোজন করতে পারে না। আবার এর থেকে কোনো কিছু বাদও দিতে পারে না। আল-কুরআনের প্রতিটি হরকত, নুকতা, শব্দ, বাক্য সবকিছুই অপরিবর্তিত।

আল-কুরআন সংরক্ষণ

আল-কুরআন সর্বপ্রথম হিফয করার মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয়। হিফয হলো মুখস্থ করা। যাঁরা পরিত্র কুরআন হিফয করেন তাঁদেরকে বলা হয় হাফিয। আরবদের স্তুতিশক্তি ছিল অসাধারণ। তারা খুব সহজেই নানা জিনিস স্মরণ রাখতে পারত। সম্ভবত আল-কুরআন মুখস্থ করার জন্যই আল্লাহ তায়ালা তাঁদের এরূপ স্তুতিশক্তি দান করেছিলেন। কুরআন মজিদের কোনো অংশ নাজিল হলে সর্বপ্রথম মহানবি (স.) তা নিজে মুখস্থ করে নিতেন। এরপর তা সাহাবিগণকে মুখস্থ করতে বলতেন। মহানবি (স.)-এর উৎসাহ ও নির্দেশে সাহাবিগণ আল-কুরআন মুখস্থ করে রাখতেন। এভাবে কুরআন মজিদ স্তুতিপটে সংরক্ষণ করা হয়।

আল-কুরআন লেখনীর মাধ্যমেও সংরক্ষণ করা হয়। কুরআনের কোনো অংশ নাজিল হলে তা মুখ্যস্থ করার পাশাপাশি লিখে রাখার জন্যও নবি করিম (স.) নির্দেশ দিতেন। যে সকল সাহাবি লিখতে জানতেন তাঁরা এ দায়িত্ব পালন করতেন। তাঁদের বলা হয় কাতেবে ওহি বা ওহি লেখক। এঁদের সংখ্যা ছিল ৪২ জন। প্রধান ওহি লেখক সাহাবি ছিলেন হযরত যায়দ ইবন সাবিত (রা.)। ওহি লেখক সাহাবিগণ সর্বদা নবি (স.)-এর সাথে থাকতেন। কুরআনের কোনো অংশ নাজিল হলে তাঁরা সাথে সাথেই তা লিখে রাখতেন। সে সময় আজকের ন্যায় কাগজ কিংবা কম্পিউটার ছিল না। তাই তখন কুরআন মজিদ খেজুর গাছের ডাল, পশুর হাড়, চামড়া, ছোট ছোট পাথর ইত্যাদিতে লিখে রাখা হতো। এভাবেও কুরআন মজিদ সংরক্ষণ করা হয়।

আল-কুরআন সংকলন

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জীবন্ধশায় আল-কুরআন অবতীর্ণ হয়। ফলে সে সময় গ্রন্থাকারে তা সংকলন করা হয়নি। বরং সে সময় হিফয ও লেখনীর সাহায্যে আল-কুরআনকে সংরক্ষণ করা হয়। রাসুলুল্লাহ (স.)-এর ইন্তিকালের পর আল-কুরআন সংকলন করা হয়।

মহানবি (স.)-এর ইন্তিকালের পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) ইসলামের প্রথম খলিফা মনোনীত হন। সে সময় কতিপয় ভগু নবির আবির্ভাব ঘটে। হযরত আবু বকর (রা.) সেসব ভগু নবির বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করেন। এ রকমই একটি যুদ্ধ ছিল ইয়ামামার যুদ্ধ। এ যুদ্ধে ভগু নবি মুসায়লামা কায়্যাবের বিরুদ্ধে মুসলমানগণ জয়লাভ করেন। তবে কুরআনের বহুসংখ্যক হাফিয শাহাদতবরণ করেন। এ অবস্থা দেখে হযরত উমর (রা.) তাবলেন- কুরআনের হাফিযগণ এভাবে ইন্তিকাল করলে এর অনেক অংশ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তাই তিনি হযরত আবু বকর (রা.)-কে কুরআন সংকলন করার পরামর্শ দেন। হযরত উমর (রা.)-এর পরামর্শ শুনে হযরত আবু বকর (রা.) কুরআন সংকলনের উদ্যোগ নেন। তিনি প্রধান ওহি লেখক সাহাবি হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.)-কে পবিত্র কুরআন গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ প্রদান করেন। তাঁর নির্দেশে হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) সাহাবিদের নিকট সংরক্ষিত কুরআনের লিখিত অংশগুলো একত্র করেন। পাশাপাশি তিনি কুরআনের হাফিযগণের সাহায্যও গ্রহণ করেন। কুরআনের প্রতিটি অংশ তিনি লেখনী ও মুখ্যস্থ এ উভয় পদ্ধতির সাথে মিলিয়ে দেখেন। এভাবে তিনি সর্বোচ্চ সতর্কতার সাথে আল-কুরআনের প্রামাণ্য পাঞ্জুলিপি প্রস্তুত করেন। আল-কুরআনের এ কপিটি খলিফা হযরত আবু বকর (রা.)-এর নিকট সংরক্ষিত ছিল। তাঁর ইন্তিকালের পর তা দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.)-এর তত্ত্বাবধানে সংরক্ষিত থাকে। হযরত উমর (রা.)-এর শাহাদতের পর এ কপিটি তাঁর মেয়ে উম্মুল মুমিনিন হযরত হাফসা (রা.)-এর নিকট সংরক্ষিত থাকে।

ইসলামের তৃতীয় খলিফা ছিলেন হযরত উসমান (রা.)। তাঁর সময়ে ইসলামি সাম্রাজ্য ছিল বিশাল-বিস্তৃত। পৃথিবীর নানা প্রান্তে ও দেশে ইসলাম ছড়িয়ে পড়েছিল। ফলে মুসলমানদের সংখ্যাও ছিল অগণিত। এ সময় বিভিন্ন অঞ্চলে কুরআনের পাঠ্যাত্মক বিপর্যয় দেখা দেয়। এমনকি এ নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে নানা অনৈক্যের সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় হযরত উসমান (রা.) বিশিষ্ট সাহাবিগণের সাথে পরামর্শ করে আল-কুরআনের একক ও প্রামাণ্য পাঠ্যাত্মক প্রচারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এজন্য তিনি হযরত যায়দ (রা.)-এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেন। এ কমিটি হযরত হাফসা (রা.)-এর নিকট সংরক্ষিত মূল পাঞ্জুলিপি থেকে আরও সাতটি অনুলিপি প্রস্তুত করেন। এরপর বিভিন্ন প্রদেশে আল-কুরআনের এক এক কপি পাঠিয়ে দেওয়া

হয়। ফলে পবিত্র কুরআনের পাঠ্যীতি নিয়ে মুসলমানদের অনেকে দূর হয়। আল-কুরআন সংরক্ষণের এরূপ অসামান্য অবদানের জন্য হ্যরত উসমান (রা.)-কে জামিউল কুরআন বলা হয়। জামিউল কুরআন অর্থ কুরআন সংকলক বা কুরআন একত্রকারী।

দলীয় কাজ : এই পাঠ পড়ে কুরআন সংকলন সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা কয়েক দলে বিভক্ত হয়ে আলোচনা করে একটি সারসংক্ষেপ লিখবে।

পাঠ ২ তাজবিদ (تجویی)

তাজবিদ আরবি শব্দ। এর অর্থ সুন্দর করা, বিন্যস্ত করা, সুন্দর করে সাজানো ইত্যাদি। আর ইসলামি পরিভাষায় আল-কুরআনকে শুন্দরভাবে সুন্দর সুরে পাঠ করাকে তাজবিদ বলা হয়। কুরআন মজিদ পড়ার বেশ কিছু নিয়ম-কানুন রয়েছে। যেমন : মাখরাজ, সিফাত, মাদ, ওয়াকফ, গুন্নাহ ইত্যাদির নিয়ম সম্পর্কে অবগত হওয়া। এসব নিয়ম-কানুন সহকারে শুন্দরভূপে কুরআন তিলাওয়াত করাকেই তাজবিদ বলা হয়। পূর্ববর্তী শ্রেণিতে আমরা মাখরাজ সম্পর্কে জেনে এসেছি। এ শ্রেণিতে আমরা তাজবিদের আরও কিছু নিয়মকানুন জানব।

পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের ফজিলত অনেক। এটি নফল ইবাদতের মধ্যে সর্বোত্তম ইবাদত। কুরআন তিলাওয়াতের ফজিলত প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন-

مَنْ قَرَأَ حُرْفًا مِّنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ حَسَنَةٌ وَّاَخْسَنَةٌ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا

অর্থ : ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব থেকে একটি হরফও পাঠ করবে, সে একটি নেকি লাভ করবে। আর এ নেকির পরিমাণ হলো দশগুণ।’ (তিরমিয়ি)

পবিত্র কুরআনের প্রতিটি হরফ বা বর্ণ তিলাওয়াতের দশটি করে সাওয়াব লেখা হয়। যেমন-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহিম)-এর মধ্যে ১৯টি বর্ণ রয়েছে। কেউ যদি এটি তিলাওয়াত করে তবে সে $(19 \times 10) = 190$ টি নেকি লাভ করবে।

অন্য হাদিসে মহানবি (স.) বলেছেন, ‘তোমরা কুরআন পাঠ কর। কেননা কিয়ামতের দিন তা পাঠকারীদের পক্ষে সুপারিশ করবে।’ (মুসলিম)

কুরআন শুন্দি ও সুন্দরভাবে তিলাওয়াতের মাধ্যমে তিলাওয়াতের এসব ফজিলত লাভ করা যায়। এজন্য তাজবিদ অনুযায়ী কুরআন তিলাওয়াত করা অত্যাবশ্যক। তাজবিদ সহকারে কুরআন পড়া আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ। তিনি বলেছেন—

وَرِّتِلُ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا

অর্থ : “আপনি কুরআন আবৃত্তি করুন ধীরে ধীরে ও সুস্পষ্টভাবে।” (সূরা আল-মুয়ামিল, আয়াত ৪)

তাজবিদ না জেনে কুরআন পাঠ করলে তা শুন্দি হয় না। আর কুরআন পাঠ শুন্দি না হলে নামায সঠিকভাবে আদায় হয় না। এরূপ তিলাওয়াতকারী কোনো সাওয়াবও লাভ করবে না।

সুতরাং আমরা শুন্দি ও সুন্দরভাবে কুরআন পাঠ করব। আর এজন্য প্রথমেই তাজবিদ শিক্ষা করব। এরপর কুরআন পাঠের সময় এ নিয়মগুলোর অনুশীলন করব।

পাঠ ৩

মাদ (মাল)

মাদ শব্দের অর্থ দীর্ঘ করা, লম্বা করা। তাজবিদের পরিভাষায় মাদের হরফের ডান দিকের হরকতযুক্ত হরফ লম্বা করে পড়াকে মাদ বলা হয়। যের, যবর ও পেশকে হরকত বলে।

মাদের হরফ মোট তিনটি। যথা- আলিফ, ওয়াও, ইয়া (ي-و-ا)।

এ তিনটি হরফ নিম্নলিখিত অবস্থায় মাদের হরফ হিসেবে উচ্চারিত হয় :

ক.। (আলিফ)-এর পূর্বের হরফে যবর (ـ) থাকলে। যেমন-ـ

খ. و (ওয়াও)-এর উপর জয়ম (ـ) এবং তার ডান পাশের হরফে পেশ (ـ) থাকলে। যেমন-ـ

গ. ي (ইয়া)-এর উপর জয়ম (ـ) এবং এর ডান পাশের অক্ষরে যের (ـ) থাকলে। যেমন-ـ

উপর্যুক্ত তিনটি অবস্থায় ي-و-ا মাদের হরফ হিসেবে গণ্য হয়। ফলে এর পূর্বের অক্ষর একটু দীর্ঘ করে পড়তে হয়।

প্রকারভেদ

মাদ প্রধানত দুই প্রকার। যথা -

১. মাদে আসলি (মূল মাদ)

২. মাদে ফারঙ্গ (শাখা মাদ)

নিম্নে এ দুটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হলো :

১. মাদ্দে আসলি (মূল মাদ্দ)

মাদ্দের হরফের ডানে বা পরে জ্যম (ـ) বা হামযা (ـ) কিংবা তাশদিদ (ـ) না থাকলে তাকে মাদ্দে আসলি বলে। মাদ্দে আসলিকে মাদ্দে তাব্যিও বলা হয়। এরূপ মাদ্দে এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হয়।

উল্লেখ্য, একটি সোজা আঙ্গুলকে স্বাভাবিকভাবে বাঁকা করে হাতের তালুতে লাগাতে যে সময়ের প্রয়োজন, তাকে এক আলিফ পরিমাণ সময় বলে।

মাদ্দে আসলির উদাহরণ : نُوحِيَّا

এ শব্দটিতে একসাথে মাদ্দে আসলির তিন ধরনের উদাহরণ রয়েছে। যেমন-

- ক. نُـ এখানে و (ওয়াও)-এর উপর জ্যম (ـ) এবং তার পূর্বের হরফ ـ (নুন)-এর উপর পেশ (ـ) রয়েছে।
- খ. نـ এখানে ي (ইয়া)-এর উপর জ্যম (ـ) এবং এর পূর্বের হরফ ح (হা)-এর নিচে যের (ـ) রয়েছে।
- গ. نـ এখানে (আলিফ)-এর পূর্বের হরফ ح (হা)-এর উপর যবর (ـ) রয়েছে।

এ তিনটি ক্ষেত্রেই মাদ্দের হরফ نـ-يـ-وـ। এর পূর্বে বা পরে জ্যম (ـ) বা, হামযা (ـ) বা তাশদিদ (ـ) নেই। সুতরাং এগুলো মাদ্দে আসলি। এরূপ অবস্থায় ح-ن-ي (নুন, হা, হা) অক্ষরকে এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হবে।

কুরআন মজিদের যে সকল হরফের উপর খাড়া যবর (ـ), নিচে খাড়া যের (ـ) এবং উপরে উল্টো পেশ (ـ) রয়েছে, সে সকল হরফকে এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হবে। যেমন-

إِلَهُ النَّاسِ
لِرَبِّهِمْ لَكَنُودٌ
مَالُهُ وَمَا كَسَبَ

এখানে ل (লাম) হরফের উপর খাড়া যবর (ـ), ح (হা) হরফের নিচে খাড়া যের (ـ) এবং ي (হা) হরফের উপর উল্টো পেশ (ـ) রয়েছে। সুতরাং, ل-ح-ي (লাম, হা, হা) হরফগুলোকে এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হবে।

২. মাদ্দে ফারঙ্গ (শাখা মাদ্দ)

ফারঙ্গ অর্থ শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট। মাদ্দে আসলি থেকে যে সকল মাদ্দ বের হয় তাকে মাদ্দে ফারঙ্গ বলে। অর্থাৎ মাদ্দের হরফের পরে জ্যম (ـ) বা হামযা (ـ) বা তাশদিদ (ـ) থাকলে সেসব স্থানে দীর্ঘ করে পড়তে হয়। একে মাদ্দে ফারঙ্গ বলে।

ফর্মা নং-৮ (ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা, ৭ম শ্রেণি)

উদাহরণ

ক. **نَلِإِ**—এ শব্দে মাদ্দের হরফ -এর পর লাম হরফে জ্যম (ঁ) হয়েছে। এটি মাদ্দে ফারঙ্গ। অতএব, আমরা এ স্থানে হামযাকে লম্বা করে পড়ব।

খ. **جَاءَ وَمَا أَدْرَكَ**—এ উদাহরণ দুটিতে মাদ্দের হরফ আলিফ -এর পর হামযা এসেছে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে জিম (জ) ও মীম (ম) হরফকে মাদ্দে ফারঙ্গ হিসেবে দীর্ঘ করে পড়তে হবে।

গ. **أَلْفَيْنِ وَلَا الصَّالِبِينِ**—আলোচ্য উদাহরণস্বয়ে মাদ্দের হরফ আলিফ -এর পর লাম (ল) এবং ফা (ফ) হরফে তাশদিদ (ঁ) হয়েছে। এটি মাদ্দে ফারঙ্গ-এর অন্যতম রূপ। এরূপ ক্ষেত্রেও হরফকে লম্বা করে পড়তে হবে।

উল্লেখ্য, আল-কুরআনের অনেক স্থানে হরফের উপর এসব মাদ্দের চিহ্ন দেওয়া থাকে। যেমন- (ـ), (ـ)। হরফের উপর এরূপ চিহ্ন থাকলে সে হরফকে লম্বা করে পড়তে হয়। হরফের উপর (ـ) চিহ্ন থাকলে চার আলিফ এবং (ـ) চিহ্ন থাকলে তিন আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হবে। যেমন- **أُوْلَئِكَ مَا أَغْنَى**

দলীয় কাজ : মাদ্দের প্রকারভেদের একটি তালিকা তৈরি কর।

বাড়ির কাজ : মাদ্দের নাম ও কোন মাদ্দ কয় আলিফ পরিমাণ
দীর্ঘ করে পড়তে হয় তা লেখ।

পাঠ ৪

ওয়াক্ফ (وقف)

ওয়াক্ফ আরবি শব্দ। এর অর্থ বিরতি দেওয়া, থামা, স্থগিত রাখা ইত্যাদি। তাজবিদের পরিভাষায় তিলাওয়াতের মধ্যে প্রযোজন অনুসারে বিরতি দেওয়াকে ওয়াক্ফ বলে। অন্য কথায়, দুই নিঃশ্বাসের মধ্যবর্তী বিরতির সময়কে ওয়াক্ফ বলা হয়।

আল-কুরআন তিলাওয়াতে ওয়াক্ফ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা আমরা বেশি সময় নিঃশ্বাস ধরে রাখতে পারি না। কিছুক্ষণ পরপর আমাদের শ্বাস নিতে হয়। তিলাওয়াতের সময়ও একশ্বাসে পুরো তিলাওয়াত করা সম্ভব নয়। এজন্য আয়াতের মধ্যে থামতে হয়। আয়াতের মধ্যে এরূপ বিরতি নেওয়াই ওয়াক্ফ।

তাজবিদ হলো কুরআন সুন্দর ও শুন্দরূপে তিলাওয়াতের নাম। সুতরাং তিলাওয়াতকালে যেখানে ইচ্ছা সেখানে থামা যাবে না। তাতে কুরআন তিলাওয়াতের সৌন্দর্য নষ্ট হয়। অনেক সময় অর্থেরও পরিবর্তন হয়ে যায়। অতএব, নির্ধারিত স্থানে ওয়াক্ফ করতে হবে। আমাদের শ্রিয় নবি (স.) সূরা ফাতিহার প্রত্যেক আয়াতের পর ওয়াক্ফ করতেন। ওয়াক্ফ করলে শেষ হরফের উপর জ্যম উচ্চারণ করতে হবে। কোনো হরকত (যবর, যের, পেশ) উচ্চারণ করে থামা যাবে না। তবে কেউ অপারগ হলে বা শ্বাস রাখতে না পারলে নির্ধারিত স্থানের

পূর্বেই ওয়াক্ফ করতে পারবে। এক্ষেত্রে তিলাওয়াত করার সময় পুনরায় যে শব্দে ওয়াক্ফ করেছে, সে শব্দ থেকে তিলাওয়াত করতে হবে। আল-কুরআনে ওয়াক্ফের নানারকম চিহ্ন দেওয়া আছে। এগুলো হলো বিরাম চিহ্ন। এগুলো সম্পর্কে জানা থাকলে শুন্ধভাবে ওয়াক্ফ করা যায়। নিম্নে এ সমস্ত চিহ্নসমূহের পরিচয় দেওয়া হলো—

০- এ চিহ্নকে বলা হয় ‘ওয়াক্ফ তাম’। এটি বাক্য বা আয়াতের চিহ্ন। অর্থাৎ এ চিহ্ন দ্বারা আয়াত শেষ হওয়া বোৰা যায়। এ চিহ্নে থামতে হবে।

م- একে ‘ওয়াক্ফ লায়িম’ বলে। এ চিহ্নে ওয়াক্ফ করা অত্যাবশ্যক। এতে ওয়াক্ফ না করলে আয়াতের অর্থ বিকৃত হয়ে যেতে পারে।

ط- এটি ‘ওয়াক্ফ মুতলাক’-এর চিহ্ন। এরূপ চিহ্নে ওয়াক্ফ করা উত্তম।

ج- এটি ‘ওয়াক্ফ জায়িয়’-এর চিহ্ন। এরূপ চিহ্নিত স্থানে থামা কিংবা না থামা উভয়ই জায়েয়। তবে এতে ওয়াক্ফ করা ভালো।

ر- একে ‘ওয়াক্ফ মুজাওয়ায’ বলে। এ চিহ্নে না থামা ভালো।

ص- এ চিহ্নকে বলা হয় ‘ওয়াক্ফ মুরাখ্তখাস’। এখানে না থামা ভালো। তবে অপারগ হলে এ স্থানে থামা যাবে।

ق- এ চিহ্নে থামা ও না থামা প্রসঙ্গে মতভেদ রয়েছে। তবে এতে না থামা ভালো।

ف- এটি ওয়াক্ফ আমর। অর্থাৎ এতে থামার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখানে থামা উচিত।

ل- এটি না থামার নির্দেশ। এরূপ স্থানে না থেমে মিলিয়ে পড়তে হবে।

ص- এ চিহ্নিত স্থানে বিরতি দেওয়া বা না দেওয়া উভয়ই জায়েয়। তবে বিরতি দেওয়াই উত্তম।

صلى- এ স্থানে মিলিয়ে পড়া উত্তম।

س/সكته- এ চিহ্নের নাম সাকতাহ। এরূপ চিহ্নিত স্থানে শূস ছাড়া যাবে না। অর্থাৎ পড়া বন্ধ থাকবে তবে শূস জারি থাকবে।

معانقة/خ- এ চিহ্নের নাম মুআনাকা। আয়াতের বা শব্দের ডানে এবং বামে (তিনবিন্দু) অথবা **ع** চিহ্ন থাকে। এ অবস্থায় তিলাওয়াতকালে এক স্থানে থামতে হয় এবং অপর স্থানে মিলিয়ে পড়তে হয়।

وقف النبى- ওয়াক্ফন নাবি (স.)। এরূপ চিহ্নিত স্থানে প্রিয় নবি (স.) ওয়াক্ফ করেছিলেন।

وقف جبرايل- ওয়াক্ফ জিবরাইল (আ.)। এরূপ চিহ্নিত স্থানে বিরতি দিলে বরকত লাভ হয়।

وقف غران - وَقْفٌ غُرَانٌ | এ স্থানে থামলে গুনাহ মাফ হওয়ার আশা করা যায়।

দলীয় কাজ : শিক্ষার্থীরা ওয়াক্ফের চিহ্নসমূহের একটি তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ ৫

নাযিরা তিলাওয়াত

আল-কুরআন তিলাওয়াতের ফজিলত অত্যধিক। পবিত্র কুরআন মুখস্থ তিলাওয়াত করা যায়। আবার দেখেও পাঠ করা যায়। দেখে দেখে তিলাওয়াত করাকে নাযিরা তিলাওয়াত বলে। নাযিরা তিলাওয়াত একটি উত্তম ইবাদত। আল্লাহ তায়ালা এরূপ তিলাওয়াতকারীকে আখিরাতে অত্যধিক সম্মান ও মর্যাদা দান করবেন। আমরাও বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করতে চেষ্টা করব।

কুরআন তিলাওয়াতের আদব

আল-কুরআন অত্যন্ত মর্যাদাবান গ্রন্থ। সুতরাং অত্যন্ত আদবের সাথে এ কিতাব তিলাওয়াত করা উচিত। আল-কুরআন তিলাওয়াতের কতিপয় আদব নিচে দেওয়া হলো—

ক. পূর্ণরূপে ওযু করে পাক-পবিত্র জায়গায় বসা।

খ. পবিত্র কুরআনকে উঁচু কোনো কিছুর উপর রাখা।

গ. মনোযোগ সহকারে তিলাওয়াত করা। কোনোরূপ কথাবার্তা, হাসি-ঠাণ্ডা না করা।

ঘ. ধীরে ধীরে তাজবিদের সাথে তিলাওয়াত করা।

ঙ. আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের জন্য তিলাওয়াত করা।

শ্রেণির কাজ

- এ শ্রেণিতে নাযিরা তিলাওয়াতের পাঠ হলো— সূরা আল-বাকারার পঞ্চম বুরু থেকে অষ্টম বুরু পর্যন্ত।
- শিক্ষক প্রথমে দেখে দেখে শুন্ধ ও সুন্দরভাবে এ আয়াতগুলো তিলাওয়াত করবেন। এ সময় শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে শুনবে। কোনোরূপ কথাবার্তা, হাসি-তামাশা, হট্টগোল করবে না।
- এরপর শিক্ষার্থীরা একেকজন করে তিলাওয়াত করবে। শিক্ষক তা শুনবেন। কারো কোনো ভুল হলে তা সংশোধন করে দেবেন। শিক্ষকের নির্দেশনামতো শিক্ষার্থীরা নিজেদের ভুলগুলো ঠিক করে নেবে।
- অতঃপর শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকে পুনরায় তিলাওয়াত করবে এবং শিক্ষক শুনবেন। শুন্ধ না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেবেন। এভাবে শিক্ষার্থীরা শুন্ধরূপে তাজবিদ সহকারে কুরআন তিলাওয়াত শিখবে। অতঃপর বাড়িতে নিয়মিত তিলাওয়াতের অভ্যাস করবে।

অর্থ ও পটভূমিসহ কুরআনের কত্তিপয় সূরা

পাঠ ৬

সূরা আল-আদিয়াত (سُورَةُ الْعِدِيَّةِ)

সূরা আল-আদিয়াত পবিত্র কুরআনের ১০০তম সূরা। এটি পবিত্র মঙ্গা নগরীতে অবতীর্ণ হয়। এ সূরায় প্রথম শব্দ আল-আদিয়াত। এ শব্দ থেকেই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে। এ সূরায় আয়াত সংখ্যা সর্বমোট ১১টি। তৎকালীন আরবে যখন এক ভয়ংকর অরাজকতা ও অস্তিত্বশীলতা বিরাজমান ছিল, আরবের গোত্রসমূহ পরম্পর রক্তপাত ও লুঠনে নিয়োজিত ছিল, কোনো গোত্রই নিরাপদে ছিল না। এ প্রেক্ষাপটে এ সূরাটি অবতীর্ণ হয় একথা স্মরণ করে দেওয়ার জন্য যে, ধন-সম্পদের লোভে অন্যায় অসৎ করলে আখিরাতে জবাবদিহি করতে হবে।

শব্দার্থ

وَ	- শপথ, কসম	كَتُوْدْ	- অকৃতজ্ঞ
الْعِدِيَّةِ	- ধাবমান অশ্বরাজি	شَهِيدْ	- সাক্ষী, অবহিত
ضَبْعًا	- উর্ধবশাসে	حُبْ	- ভালোবাসা, আসক্তি
فَالْمُؤْرِيَّةِ	- অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরণকারী	خَمْر	- ভালো, কল্যাণ, ধন-সম্পদ
قَدْحًا	- ক্ষুরাঘাতে, ক্ষুরের আঘাতে	شَلْبِدْ	- কঠোর, কঠিন, প্রবল
الْمُغِيْرِيَّةِ	- হামলাকারী, আক্রমণকারী, অভিযানকারী	بُعْزِرْ	- উঞ্চিত হবে, উঠানো হবে
ضَبْعًا	- প্রত্যুষে, প্রভাতে, প্রভাতকালে	حُصِّلْ	- প্রকাশ করা হবে
أَرْنَ	- উৎক্ষিপ্ত করে	الْأَصْلُورْ	- অন্তরসমূহ, বক্ষসমূহ
نَفْعًا	- ধূলি	خَبِيرْ	- অবহিত, সর্বজ্ঞতা
وَسْطَنْ	- মধ্যে চুকে পড়ে		

অনুবাদ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

وَالْعِدِيَّةِ ضَبْعًا

১. শপথ উর্ধবশাসে ধাবমান অশ্বরাজির।

فَالْمُؤْرِيَّةِ قَدْحًا

২. যারা ক্ষুরের আঘাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত করে।

فَالْمُغِيْرَاتِ صُبْحًا

৩. যারা প্রভাতকালে অভিযান চালায়।

فَأَثْرَنَ بِهِ نَقْعًا

৪. আর সে সময় ধূলি উৎক্ষিপ্ত করে।

فَوَسْطَنَ بِهِ جَمْعًا

৫. অতঃপর শক্রদের মধ্যে ঢুকে পড়ে।

إِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ

৬. নিচয়ই মানুষ তার প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ।

وَإِنَّهُ عَلَى ذِلِكَ لَشَهِيدٌ

৭. আর সে এ বিষয়ে অবশ্যই অবহিত।

وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَهِيدٌ

৮. এবং নিচয়ই সে ধন-সম্পদের প্রতি প্রবলভাবে আসন্ত।

أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بَعْزَرَ مَا فِي الْقُبُورِ

৯. তবে কি সে সেই সম্পর্কে অবহিত নয়, যখন কবরে যা আছে তা উথিত হবে?

وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ

১০. এবং অন্তরে যা কিছু আছে তা প্রকাশ করা হবে?

إِنَّ رَبَّهُمْ هُمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرُونَ

১১. সেদিন তাদের কী হবে, সে সম্পর্কে তাদের প্রতিপালক অবশ্যই সবিশেষ অবহিত।

ব্যাখ্যা

এ সূরা তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথম পাঁচ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সামরিক অশ্বের মানা গুণ বর্ণনা এবং এগুলোর শপথ করেছেন। অতঃপর দ্বিতীয় পর্যায়ে আল্লাহ তায়ালা মানুষের দুটি বিশেষ স্বভাব সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। এগুলো হলো—

ক. সুষ্ঠার প্রতি অকৃতজ্ঞতা।

খ. সম্পদের প্রতি লোভ-লালসা।

আর মানুষ স্বেচ্ছায়, সজ্জানে এ দুটি কাজ করে থাকে। অথচ এগুলো মানুষের করা একেবারেই অনুচিত।

এজন্য সূরার শেষ পর্যায়ে মানুষকে আধিরাত ও কবরের জীবনের কথা মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, মানুষ কি জানে না যে তাকে কবরে যেতে হবে। অতঃপর কিয়ামতে তাদের সকল কার্যকলাপ প্রকাশ করা হবে। এমনকি সে অন্তরে যেসব অকৃতজ্ঞতা ও লোভ-লালসা পোষণ করত, তাও প্রকাশ করা হবে। পরিশেষে সমস্ত কিছুর বিচার করা হবে। আর সেদিনের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা খুব ভালোভাবেই অবহিত। সুতরাং মানুষের উচিত সকল অন্যায় ও অকৃতজ্ঞতা ত্যাগ করে সংপথে জীবনযাপন করা।

শিক্ষা

এ সূরা থেকে আমরা নিম্নোক্ত শিক্ষা লাভ করি :

- নিঃসন্দেহে মানুষ তার প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ।
- ধন-সম্পদের প্রতিও মানুষের আসঙ্গি প্রবল।
- আধিরাতে মানুষের অন্তরের গোপন বিষয়ে প্রকাশ করা হবে।
- অতঃপর আল্লাহ তায়ালা মানুষের চূড়ান্ত ফায়সালা করবেন।

অতএব, আমরা সর্বদা এ সূরার শিক্ষা মনে রাখব। আল্লাহ তায়ালার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করব। কখনোই তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞ হবো না। সাথে সাথে ধন-সম্পদের লোভে পড়ে অন্যায় ও অসৎ কাজ করব না। বরং আধিরাতে জবাবদিহি করার কথা স্মরণ রেখে সর্বদা আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করব।

বাড়ির কাজ : শিক্ষার্থী সূরা আদিয়াতের তিনটি শিক্ষা খাতায় লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৭

সূরা আল-কারিআহ (سُورَةُ الْقَارِعَةِ)

সূরা আল-কারিআহ যাকি সূরাসমূহের মধ্যে অন্যতম। এটি পবিত্র কুরআনের ১০১তম সূরা। এর আয়াত সংখ্যা ১১টি।

এ সূরার প্রথম শব্দ আল-কারিআহ। কারিআহ অর্থ সজোরে আঘাতকারী। কিয়ামত বা মহাপ্লয় পৃথিবীকে সজোরে আঘাত করবে বলে একে কারিআহ বলা হয়। এ সূরায় কিয়ামতের নানা অবস্থার বর্ণনা করা হয়েছে। এজন্য এ সূরার নাম রাখা হয়েছে আল-কারিআহ বা মহাপ্লয়।

তৎকালীন আরবে মানুষ যখন পারস্পরিক দম্প-সংঘাত, লুটতরাজ ও পাপাচারে লিঙ্গ ছিল তখন তাদেরকে কিয়ামতের মহাপ্লয় এবং হাশরের বিচার ও দোয়খের কঠিন শাস্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এ সূরাটি নাজিল হয়েছে।

শব্দার্থ

الْقَارِعَةُ	- মহাপ্লয়, সজোরে আঘাতকারী	مَوَازِينٌ	- পাঞ্চাসমূহ, পরিমাপ দণ্ডগুলো
يَوْمَ	- দিন	عِيشَةٌ	- জীবন, জীবিকা
الْفَرَاش	- পতঙ্গ	رَاضِيَةٌ	- সন্তোষজনক
الْبَئْثُوُثُ	- বিক্ষিপ্ত, ছড়ানো-ছিটানো	خَفَّتْ	- হালকা হবে
الْبَيْلُ	- পর্বতসমূহ	أُمْ	- স্থান, জায়গা, ঠিকানা
الْعَوْنَى	- রঙিন পশম	هَاوِيَةٌ	- হাবিয়া, গভীর গর্ত, এটি একটি জাহানামের নাম
الْمَنْفُوشُ	- ধূনিত	غَرْ	- আগুন
تَقْلُتُ	- ভারী হবে	حَامِيَةٌ	- উত্তপ্ত, প্রজ্বলিত, ভুলভ

অনুবাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

৮. الْقَارِعَةُ

১. মহাপ্লয়।

৯. مَا الْقَارِعَةُ

২. মহাপ্লয় কী?

১০. وَمَا أَدْرَكَ مَا الْقَارِعَةُ

৩. আপনি কি জানেন মহাপ্লয় কী?

يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَادِ إِلَّا مَنْ شُوِّهَ

৪. সেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঞ্জের মতো ।

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ

৫. আর পর্বতসমূহ ধূনিত রঙিন পশমের মতো হবে ।

فَأَمَّا مَنْ تَقْلِبَتْ مَوَازِينُهُ

৬. অতঃপর সেদিন যার পাল্লা ভারী হবে ।

فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ

৭. সে লাভ করবে সভোষজনক জীবন ।

وَأَمَّا مَنْ حَفَّتْ مَوَازِينُهُ

৮. আর যার পাল্লা হালকা হবে ।

فَأَمْهَأَهَا وَيْهَةً

৯. তার স্থান হবে হাবিয়া ।

وَمَآذِرِكَ مَا هِيَهُ

১০. আপনি কি জানেন তা কী?

وَأَرْ حَامِيَةً

১১. তা অতি উত্তপ্ত আগুন ।

ব্যাখ্যা

সুরা আল-কারিআহতে আল্লাহ তায়ালা দুই ধরনের বিষয় উল্লেখ করেছেন । সুরার প্রথম পাঁচ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা কিয়ামত বা মহাপ্রলয়ের অবস্থা বর্ণনা করেছেন । কিয়ামতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা সমগ্র পৃথিবী ধ্বংস করবেন । এজন্য এ সুরায় তিনি আল-কারিআহ বা মহাপ্রলয় শব্দটি ব্যবহার করেছেন । এর মাধ্যমে কিয়ামতের অবস্থা বর্ণনা করেছেন । সেদিন এ পৃথিবীর কোনো কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না । বড় বড়

পাহাড়-পর্বত পর্যন্ত সেদিন ধূনিত পশ্চমের ন্যায় উড়তে থাকবে। মানুষ কীটপতঙ্গের ন্যায় বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। আসমান, জমিন, সাগর, নদী, বন-জঙ্গল সবকিছুই সেদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। সেদিন শুধু আল্লাহ তায়ালা থাকবেন। তিনি ব্যতীত সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে।

এ সূরায় দ্বিতীয় পর্যায়ে শেষ ডটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার কাজকর্মের পরিণতি বর্ণনা করেছেন। হাশরের ময়দানে সমস্ত মানুষের হিসাবনিকাশ নেওয়া হবে। মানুষের পাপপুণ্য পাল্লায় ওজন করা হবে। দুনিয়াতে যে ব্যক্তি পুণ্য বা নেক কাজ করবে, তার পুণ্যের পাল্লা ভারী হবে। সে লাভ করবে চিরশান্তির জাহান। সে সেখানে সন্তুষ্ট চিত্তে বসবাস করবে। অপরদিকে যার পুণ্যের পাল্লা হালকা হবে তার পাপের পাল্লা ভারী হবে। তাকে জাহানামে নিষ্কেপ করা হবে। হাবিয়া নামক দোষখ হবে তার বাসস্থান। হাবিয়া খুবই গভীর স্থান। এতে রয়েছে উত্তম আগুন। সেখানে পাপীরা কঠিন শাস্তি ভোগ করবে।

শিক্ষা :

- এ দুনিয়ার জীবন ও দুনিয়া উভয়ই ক্ষণস্থায়ী।
- মহাপ্লঘের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা গোটা দুনিয়া ও স্ফুরিজগৎ ধ্বংস করে দেবেন।
- হাশরে মানুষের ভালোমন্দের বিচার করা হবে।
- নেককার ব্যক্তির স্থান হবে চিরশান্তির জাহান।
- আর পাপীদের ঠিকানা হবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির জাহানাম।

আমরা এ সূরাটি অর্থসহ মুখস্থ করব। এ সূরার শিক্ষা অনুসারে সর্বদা ভালো কাজ করব। অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত থাকব।

বাড়ির কাজ : শিক্ষার্থী সূরা আল-কারিআহর শিক্ষাগুলো লিখে বাড়ি থেকে একটি পোস্টার তৈরি করে নিয়ে আসবে।

পাঠ ৮

সূরা আত-তাকাসুর (سُورَةُ الْتَّكَاثِرِ)

এ সূরার প্রথম আয়াতে বর্ণিত তাকাসুর শব্দ থেকে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে সূরা আত-তাকাসুর। এটি পবিত্র কুরআনের ১০২তম সূরা। এটি পবিত্র মুক্তি নগরীতে অবতীর্ণ হয়। এর আয়াত সংখ্যা ৮টি।

রাসুলুল্লাহ (স.) একদা সাহাবিগণকে বলেন, তোমাদের মধ্যে এমন ক্ষমতা কারো নেই যে সে দৈনিক এক হাজার আয়াত তিলাওয়াত করবে। উন্নরে তারা বললেন, হ্যাঁ এক হাজার আয়াত পাঠ করার শক্তি কয়জনেরই বা আছে? অতঃপর রাসুল (স.) বললেন, তোমাদের কেউ কি প্রতিদিন সূরা তাকাসুর পাঠ করতে পারবে না? উল্লেখ্য, প্রতিদিন এই সূরা একবার পাঠ করা এক হাজার আয়াত তিলাওয়াত করার সমান। (মাযহারি)

শানে নুয়ুল

কুরাইশের শাখাগোত্র ছিল বনু আবদি মানাফ, বনু কুসাই ও বনু সাহম। এদের প্রত্যেক গোত্র অপর গোত্রকে লক্ষ্য করে বলত, কি নেতৃত্ব, কি ক্ষমতা কিংবা জনসংখ্যা সবদিক থেকেই আমরা তোমাদের উপরে। এতে করে প্রথমে বনু আবদি মানাফই সবার উপরে প্রমাণিত হলো। শেষে সবাই বলল, আমাদের মধ্যে যারা মারা গেছে তাঁদেরকেও হিসাব করব। কাজেই তারা কবরস্থানে গিয়ে হাজির হলো এবং কোনটা কার কবর তা বলে বলে গুনতে শুরু করল। এবার বনু সাহমের সংখ্যায় তিনি পরিবার বেশি হলো। কেননা জাহিলি যুগে তাঁদের জনসংখ্যা বেশি ছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এই সূরা নাজিল হয়।

শব্দার্থ

الْهَاكُمُ	- তোমাদের মোহাচ্ছন্ন করেছে, মোহাবিষ্ট করেছে	لَوْ	- যদি
الْتَّكَافِرُ	- প্রাচুর্য, প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা	عِلْمٌ	- জ্ঞান
حَتْتٍ	- পর্যন্ত, যতক্ষণ না, এমনকি	الْيَقِينُ	- দ্রুত বিশ্বাস, নিশ্চিত
زَرْتُمْ	- তোমরা সাক্ষাৎ করেছ, তোমরা উপনীত হয়েছ,	أَبْجِيمُ	- জাহিম, একটি জাহানামের নাম
	তোমরা মুখোমুখি হয়েছ।	عَذْنٌ	- চক্ষু, চোখ
الْمَقَابِرُ	- কবরসমূহ	يَوْمَئِيلٌ	- সোদিন
لَلٌ	- কখনোই না	عَنِ	- হতে, থেকে, সম্পর্কে
سُوْفَ	- অচিরেই, শৈঘ্রই	الْتَّعْيِيمُ	- নিয়ামত
تَعْلِمُونَ	- তোমরা জানবে		
ثُمَّ	- অতঃপর, আবার		

অনুবাদ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

۝**الْهَاكُمُ التَّكَافِرُ**

১. প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদের মোহাচ্ছন্ন করে রাখে।

۝**حَتْتٍ زَرْتُمْ الْمَقَابِرَ**

২. যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও। (এমনকি এ অবস্থায় তোমরা মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে যাও)

۝**كَلَّا سُوْفَ تَعْلِمُونَ**

৩. এটা সংগত নয়, তোমরা অচিরেই তা জানতে পারবে।

ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ

৪. আবার বলি, এটা সংগত নয়, তোমরা শীঘ্রই তা জানতে পারবে।

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ

৫. সাবধান! তোমাদের নিশ্চিত জ্ঞান থাকলে অবশ্যই তোমরা মোহাচ্ছন্ন হতে না।

لَتَرَوْنَ الْجَحِيْمَ

৬. তোমরা অবশ্যই জাহানাম দেখবে।

ثُمَّ لَتَرَوْنَهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ

৭. আবার বলি, তোমরা তা অবশ্যই চাক্ষুষ প্রত্যয়ে দেখবে।

ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِنِ عَنِ النَّعِيْمِ

৮. অতঃপর অবশ্যই সেদিন তোমাদের নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

ব্যাখ্যা

এ সূরায় ধন-সম্পদের মোহ ও প্রতিযোগিতা সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। মানুষ স্বভাবতই ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সা ইত্যাদির প্রতি লোভী। প্রাচুর্য লাভের জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকা অবস্থাতেই মানুষের মৃত্যু এসে যায়। অথচ সে মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য কোনো প্রস্তুতিই নিতে পারে না। কিন্তু এরূপ করা ঠিক নয়। কেননা ধন-সম্পদ হলো ক্ষণস্থায়ী বিষয়। এগুলোর প্রতি মোহ মানুষকে আচ্ছন্ন করে রাখে। অথচ আধিরাতের সাফল্য ও কল্যাণ এগুলোর তুলনায় কতোইনা উত্তম। মানুষের উচিত দুনিয়ার তুলনায় আধিরাতকে প্রাথান্য দেওয়া। মানুষ যদি আধিরাতের বাস্তবতাকে উপলব্ধি করত তবে কখনোই দুনিয়ার প্রাচুর্যের প্রতি আকৃষ্ট হতো না।

মৃত্যুর পর মানুষ আধিরাতকে বুঝতে পারবে। আধিরাতের নানা বিষয় চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করবে। অথচ সে তখন কিছুই করতে পারবে না। বরং দুনিয়ায় প্রাপ্ত নিয়ামত সম্পর্কে সে জিজ্ঞাসিত হবে। দুনিয়ার লোভ-লালসা ও অন্যায়-অন্তিকারী জন্য সে জাহানাম প্রত্যক্ষ করবে।

শিক্ষা :

- সম্পদের প্রাচুর্যের প্রতি মোহাচ্ছন্ন থাকা উচিত নয়।
- এটি মানুষকে আধিরাত ভুলিয়ে দেয়।
- অন্যায়ভাবে ধন-সম্পদ উপার্জনকারী জাহানামে নিষ্ক্রিয় হবে।
- আধিরাতে সকল কাজের হিসাব নেওয়া হবে।

অতএব, আমরা ধন-সম্পদের প্রতি লোভ-লালসা করব না। বরং বৈধভাবে প্রয়োজনমতো ধন-সম্পদ উপার্জন করব। আর আল্লাহ তায়ালার নির্দেশনামতো খরচ করব। অন্যায়ভাবে ধন-সম্পদ প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা করব না।

দলীয় কাজ : শিক্ষার্থী সূরা আত-তাকাসুরের শানে নুযুল পাশের বন্ধুকে বলবে।

বাড়ির কাজ : শিক্ষার্থী সূরা আত-তাকাসুরের শিক্ষাগুলো লিখে একটি পোস্টার তৈরি করবে।

পাঠ ৯

সূরা আল-লাহাব (سُورَةُ الْلَّهِبْ)

সূরা আল-লাহাব মক্কা নগরীতে অবস্থীর্ণ। এর আয়াত সংখ্যা ৫টি। এ সূরায় আবু লাহাবের চরিত্র ও পরিণতির কথা বর্ণনা করা হয়েছে বিধায় এর নামকরণ করা হয়েছে সূরা লাহাব। এটি আল-কুরআনের ১১১তম সূরা।

শানে নুযুল

একদা রাসুলুল্লাহ (স.) সাফা পর্বতে আরোহণ করে কুরাইশদের ডাক দিলেন। তৎকালীন সময়ে আরবে বিপদাপদের ক্ষেত্রে এভাবে আহ্বান করার প্রচলন ছিল। তাই রাসুল (স.)-এর ডাকে সকলেই পাহাড়ের পাদদেশে সমবেত হলো। রাসুলুল্লাহ (স.) বললেন, আমি যদি বলি যে এ পাহাড়ের অপর পাশে একটি শক্রদল তোমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। যেকোনো সময় তারা তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। তাহলে তোমরা কি তা বিশ্বাস করবে? সকলেই সমস্তেরে বলল, হ্যাঁ, অবশ্যই আমরা বিশ্বাস করব। এরপর রাসুলুল্লাহ (স.) বললেন, আমি তোমাদের এক ভীষণ শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করছি। (তোমরা স্বীকার কর যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো মারুদ নেই এবং মৃত্তিপূজা পরিত্যাগ কর।) রাসুলুল্লাহ (স.)-এর এ দাওয়াত শুনে আবু লাহাব বলে উঠল—

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অর্থ : ‘তোমার ধ্বংস হোক। এজন্যই কি তুমি আমাদের একত্র করেছ?’

অতঃপর আবু লাহাব রাসুল (স.)-কে পাথর মারতে উদ্যত হয়। আবু লাহাবের এ কথা ও কাজে অসন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহ তায়ালার সূরা নাজিল করেন। (সহিত বুখারি)

শব্দার্থ

تَبَّعَ	- ধ্বংস হোক, বিনষ্ট হোক।	ذَاتَ لَهُبْ	- লেলিহান, শিখাযুক্ত
إِرْبَأْ	- দুইহাত	إِمْرَأَ	- তার স্ত্রী
يَيْ	- হাত	كَعْلَأَ	- বহনকারিণী
كَعْلَى	- কোনো কাজে আসেনি, কোনো উপকার আসেনি, রক্ষা করেনি	الْحَكْطَبْ	- কাঠ, লাকড়ি, ইঞ্চন
كَسْبَ	- সে উপার্জন করেছে	جِنِيلْ	- গলা

سَيِّصْلٰ ۱۵ - সে অচিরেই প্রবেশ করবে أَنْ - আগুন, দোষখ	حَبْلٌ مَسِّيٰ - রশি, ফাঁস, রজ্জু - পাকানো, পঁয়চানো
----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

অনুবাদ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

تَبَّعَثُ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ

১. আবু লাহাবের দুই হাত ধূংস হোক এবং ধূংস হোক সে নিজেও।

مَا أَغْفَى عَنْهُ مَالَةٌ وَمَا كَسَبَ

২. তার ধন-সম্পদ ও যা সে উপার্জন করেছে তা কোনো কাজে আসেনি।

سَيِّصْلٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ

৩. শীত্রই সে লেলিহান আগুনে প্রবেশ করবে।

وَأَمْرَأٌ تُهَاجَّلَةً الْكَطِيبٍ

৪. এবং তার স্ত্রীও (প্রবেশ করবে) যে ইন্ধন বহন করে।

فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَسِّيٰ

৫. তার গলায় পাকানো রশি।

ব্যাখ্যা

আবু লাহাব ছিল ইসলাম ও নবি করিম (স.)-এর শক্ত। সে সর্বদাই ইসলামের শক্ততায় লিপ্ত ছিল। এ সূরায় তার শোচনীয় পরিণতির কথা বলা হয়েছে। আবু লাহাব ছিল রাসুল (স.)-এর চাচা। মক্কা নগরীতে সে প্রভৃতি সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী ছিল। সে প্রচুর ধন-সম্পদেরও মালিক ছিল। কিন্তু এত কিছুও তার কোনো কাজে আসেনি। বরং দুনিয়াতেও আবু লাহাবের ধূংস। আর আখিরাতেও সে জাহানামের শাস্তি ভোগ করবে। তার স্ত্রীও ছিল তারই মতো ইসলামের শক্ত। সেও রাসুল (স.)-কে কষ্ট দিত। সে রাসুল (স.)-এর চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখত। ফলে তার প্রতিও আল্লাহ তায়ালার অভিশাপ রয়েছে এবং আখিরাতে যত্নগান্ধায়ক শাস্তি ভোগ করবে।

শিক্ষা

- রাসূলুল্লাহ (স.) ও ইসলামের বিরোধিতা খুবই মারাত্মক কাজ।
- এর ফলে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানের ধর্ষণ অনিবার্য।
- দুনিয়ার মানসম্মান, ধন-সম্পদ ইসলামের এসব শক্তিকে ধর্ষণ থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

বাড়ির কাজ : শিক্ষার্থী সূরা আল-লাহাবের শিক্ষাগুলোর একটি তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ ১০

সূরা আল-ইখলাস (الْخَلَاص)

সূরা আল-ইখলাস আল-কুরআনের ১১২তম সূরা। এর আয়াত সংখ্যা ৪টি। এ সূরাটি পবিত্র মুক্তি নগরীতে অবতীর্ণ হয়। এ সূরার ফজিলত অত্যন্ত বেশি। মহানবি (স.) বলেছেন, এই সূরাটি কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান (সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম)। অন্য একটি হাদিসে এসেছে, জনেক ব্যক্তি রাসূল (স.)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল! আমি এ সূরাটি খুব ভালোবাসি। উত্তরে নবি করিম (স.) বললেন, এর ভালোবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। (জামি তিরমিয়ি)

শানে নুযুল

একবার মক্কার মুশরিকরা মহানবি (স.)-এর নিকট আল্লাহ তায়ালার বৎশ পরিচয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। এদের প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ তায়ালা এ সূরা নাজিল করেন। (জামি তিরমিয়ি)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, মুশরিকরা আরও প্রশ্ন করেছিল আল্লাহ তায়ালা কীসের তৈরি- স্বর্ণ, রৌপ্য না অন্য কিছুর? তাদের এ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আল্লাহ তায়ালা এ সূরা নাজিল করেন।

শব্দার্থ

قُلْ هُوَ أَكُلْ الصَّمْدُ	<ul style="list-style-type: none"> - আপনি বলুন, তুমি বলো - তিনি, সে। - একক, এক-অধিতীয়। - অমুখাপেক্ষী, বে-নিয়ায়, যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, স্বয়ংসম্পূর্ণ। 	لَمْ يَلِدْ لَمْ يُوْلَدْ كُفُوا!	<ul style="list-style-type: none"> - তিনি কাউকে জন্ম দেননি - তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি - সমতুল্য, সাদৃশ্যপূর্ণ, সমকক্ষ।
-----------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

অনুবাদ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝

১. বলুন, (হে নবি!), তিনিই আল্লাহ, এক ও অদ্বিতীয়।

اللَّهُ الصَّمَدُ ۝

২. আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, (সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী)।

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝

৩. তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি।

وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ ۝

৪. আর তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।

ব্যাখ্যা

এ সূরা তাওহিদ বা একত্বাদের সুপ্রসিদ্ধ দলিল। এ সূরায় সংক্ষিপ্তরূপে আল্লাহ তায়ালার পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। এতে মুশরিক ও কাফিরদের বিশ্বাসের জবাব দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা এক ও অদ্বিতীয়। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ। সবকিছু তিনি একাই সৃষ্টি করেছেন এবং একাই নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি কারো সাহায্যের মুখাপেক্ষী নন। বরং সৃষ্টিজগতের সবকিছুই তাঁর মুখাপেক্ষী। আর তাঁর কোনো কিছুরই প্রয়োজন নেই। তিনি সকল প্রয়োজনের উর্ধ্বে। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি। তিনি একক ও অদ্বিতীয়। বিশুজগতে তাঁর সমকক্ষ বা সমতুল্য কেউই নেই।

শিক্ষা

- আল্লাহ একক ও অদ্বিতীয়।
- তাঁর স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পিতামাতা কেউ নেই।
- তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সর্বশক্তিমান।
- তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।

আমরা আল্লাহর একত্বাদে বিশ্বাস করব। তাঁর সাথে কাউকে শরিক করব না।

দলীয় কাজ : শিক্ষার্থীরা সূরা আল-ইখলাসের শিক্ষাগুলো লিখে একটি রঙিন পোস্টার তৈরি করবে।

পাঠ ১১

মুনাজাতমূলক আয়াত

আল্লাহ তায়ালা আমাদের রব। তিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিযিকদাতা ও রক্ষক। তিনি অমুখাপেক্ষী ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। তিনি আমাদের আলো, বাতাস, পানি, খাদ্য ইত্যাদি দান করেন। পৃথিবীর সকল নিয়ামত তাঁরই দান। তিনি আমাদের বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করেন। তাঁর দয়া ও করুণাতেই আমরা দুঃখ-কষ্ট থেকে রক্ষা পাই। এককথায় সকল কিছু তাঁরই অধীন। তাঁর হুকুমেই সবকিছু পরিচালিত হয়। পার্থিব জীবনে আমাদের যা কিছু প্রয়োজন, তাও তিনি দান করেন।

সুতরাং আমাদের উচিত তাঁরই কাছে সবকিছুর জন্য প্রার্থনা করা। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে তার প্রয়োজন সম্বন্ধে প্রার্থনা করে না, আল্লাহ তার প্রতি বুঝত হন।’ (জামি তিরমিয়ি)। আল্লাহ তায়ালার নিকট কিছু চাওয়ার মাধ্যম হলো মুনাজাত করা। মুনাজাতের মাধ্যমে আমরা আল্লাহর নিকট আমাদের চাহিদা জানাতে পারি। আল-কুরআনে মুনাজাতমূলক বহু আয়াত রয়েছে। এ পাঠে আমরা এরূপ তিনটি মুনাজাতমূলক আয়াত শিখব। অতঃপর এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার নিকট মুনাজাত করব।

আয়াত ১

رَبَّنَا اظْلِمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَكُونَنَّ مِنَ الْخَسِيرِ
○

অর্থ : “হে আমাদের প্রতিপালক ! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করছি। তুমি যদি আমাদের ক্ষমা না কর এবং আমাদের প্রতি দয়া না কর তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবো।” (সূরা আল-আ’রাফ, আয়াত ২৩) সর্বপ্রথম এ মুনাজাত হ্যরত আদম (আ.) ও হ্যরত হাওয়া (আ.) করেছিলেন। আল্লাহ তায়ালা হ্যরত আদম ও হাওয়া (আ.)-কে সৃষ্টি করে জানাতে বসবাস করতে নির্দেশ দেন। জানাতে আল্লাহ তায়ালা তাঁদেরকে সকল নিয়ামত ভোগ করার অনুমতি দেন। শুধু একটি নির্দিষ্ট গাছের নিকটবর্তী হতে নিষেধ করেন। কিন্তু আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) শয়তানের প্ররোচনায় ঐ নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে ফেলেন। তাঁদের এ কাজের জন্য মহান আল্লাহ বেহেশত থেকে দুনিয়াতে পাঠিয়ে দেন। দুনিয়ায় এসে আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) তাঁদের ভুল বুঝতে পারেন। তাঁরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে কান্নাকাটি করতে থাকেন। পরিশেষে আল্লাহ তায়ালা দয়াপরবশ হয়ে তাঁদের উপর্যুক্ত মুনাজাত শিক্ষা দেন। অতঃপর হ্যরত আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) এ মুনাজাতের মাধ্যমে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ফলে আল্লাহ তায়ালা তাঁদের দোয়া কবুল করেন এবং ক্ষমা করে দেন।

এ আয়াত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মুনাজাত। প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় আমরা নানারকম পাপ করে থাকি। আমরা আল্লাহ তায়ালার আদেশ-নিষেধ লঙ্ঘন করে থাকি। এমতাবস্থায় আমাদের উচিত অপরাধসমূহ স্বীকার করা। অতঃপর এ মুনাজাতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা। তাহলে আশা করা যায় ফর্মা নং-১০(ইসলাম ও নেতৃত্ব শিক্ষা, ৭ম শ্রেণি)

আল্লাহ তায়ালা আমাদের প্রতি দয়া করবেন এবং আমাদের পাপ মাফ করে দেবেন।

আয়াত ২

رَبَّنَا أَتَنَا مِنْ لُذْكَرْ حَمَّةٍ وَهَيْئَةٍ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۝

অর্থ : “হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি নিজ থেকে আমাদের প্রতি দয়া কর এবং আমাদের কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনা করার ব্যবস্থা কর।” (সূরা আল-কাহফ, আয়াত ১০)

মুনাজাতটি আসহাবে কাহফের যুবকগণ করেছিলেন। আল্লাহ তায়ালা সূরা কাহফে তাঁদের ঘটনা ও মুনাজাত উল্লেখ করেছেন। আমাদের প্রিয় নবি (স.)-এর আগমনের কয়েকশ বছর পূর্বের ঘটনা। দাকইয়ানুস নামক এক অত্যাচারী বাদশাহ ছিল। সে ইমানদারদের উপর খুব অত্যাচার করত। তার অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কয়েকজন যুবক পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেন। তাঁদের সাথে একটি কুকুরও ছিল। তাঁদেরকে আসহাবে কাহফ বলা হয়। তাঁরা গুহাতে আল্লাহ তায়ালার ইবাদতে মশগুল থাকতেন। গুহায় থাকাবস্থায় তাঁরা আল্লাহ তায়ালার সাহায্য প্রার্থনা করে এ মুনাজাত করেন। আল্লাহ তায়ালাও তাঁদের দোয়া করুল করেন।

নেককার ও পুণ্যবানগণ কখনোই আল্লাহ তায়ালার ইবাদত ত্যাগ করেন না। শত অত্যাচারেও তাঁরা যথাযথভাবে মহান আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকেন। এজন্য প্রয়োজনে নিজেদের ঘরবাড়ি, দেশভ্যাগ করতেও পিছপা হন না। আমরাও তাঁদের মতো আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করব। কোনো অবস্থাতেই আল্লাহ তায়ালার ইবাদত ছাড়ব না। বরং কোনো অসুবিধা দেখা দিলে আল্লাহ তায়ালার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করব। ফলে তিনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন এবং আমাদের সকল কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে সাহায্য করবেন।

আয়াত ৩

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ آنْبَلْنَا وَإِلَيْكَ الْمُصِيرُ ۝

অর্থ : “হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমারই উপর নির্ভর করেছি, তোমারই অভিমুখী হয়েছি এবং প্রত্যাবর্তন তো তোমারই নিকট।” (সূরা আল-মুমতাহিনা, আয়াত ৪)

এ মুনাজাত করেছিলেন হ্যরত ইবরাহিম (আ.)। কাফিরদের অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য তিনি আল্লাহ তায়ালার নিকট এ মুনাজাত করেন।

বস্তুত, আল্লাহ তায়ালা সকল কিছুর মালিক। তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ ব্যতীত আমরা কোনো কিছু করতে পারব না। সুতরাং সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদন সকল অবস্থায় আমরা আল্লাহ তায়ালার দয়ার উপর নির্ভর করব। সকল কাজে তাঁরই অভিমুখী হবো। তাহলে আল্লাহ তায়ালা আমাদের সাহায্য করবেন। উক্ত মুনাজাত আমাদের এ শিক্ষা প্রদান করে।

দলীয় কাজ : শিক্ষার্থীরা মুনাজাতমূলক আয়াত তিনটি অর্থসহ একে অন্যকে মুখস্থ বলবে।

বাড়ির কাজ : শিক্ষার্থীরা মুনাজাতমূলক আয়াত তিনটি পড়ার টেবিলের সামনে ঝুলিয়ে রাখার জন্য সুন্দর করে লিখে একটি পোস্টার তৈরি করবে।

পাঠ ১২

আল-হাদিস (الْحَدِيدُ)

হাদিস আরবি শব্দ। এর অর্থ কথা, বাণী ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় মহানবি হ্যরত মুহাম্মদ (স.)-এর বাণী, কর্ম ও মৌনসম্বত্তিকে হাদিস বলা হয়।

হাদিসের গুরুত্ব

মানবজাতির হিদায়াতের জন্য আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে বহু নবি-রাসূল পাঠিয়েছেন। তাঁরা মানুষকে সত্য পথের সম্মান দিতেন। হাতে-কলমে পুণ্য ও ন্যায় কাজের শিক্ষা দিতেন। তাঁরা ছিলেন মানবজাতির আদর্শ। আমাদের প্রিয় নবি হ্যরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবি ও রাসূল। তাঁর পর আর কোনো নবি আসবেন না। তিনি ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। তাঁর শিক্ষা ও আদর্শই কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষকে অনুসরণ করতে হবে। সুতরাং তাঁর সকল কথা ও কর্ম সংরক্ষণ করা অত্যন্ত জরুরি। এগুলো জানার মাধ্যমেই আমরা তাঁর আদর্শ অনুসরণ করতে পারি। হাদিস শরিফ হলো নবি করিম (স.)-এর জীবনের সকল কাজ-কর্মের সংরক্ষক। এর মাধ্যমেই আমরা মহানবি (স.)-এর সকল নির্দেশনা ও শিক্ষা জানতে পারি।

যদি হাদিস শরিফ না থাকত, তবে আমরা এসব কিছু জানতে পারতাম না। সুতরাং পুণ্য ও ন্যায়ের পথে চলার জন্য হাদিস শরিফের প্রয়োজনীয়তা অনঙ্গীকার্য।

হাদিস ইসলামি জীবনব্যবস্থার দ্বিতীয় উৎস। আল-কুরআনের পরই হাদিসের স্থান। হাদিস আল-কুরআনের ব্যাখ্যাস্বরূপ। আল-কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বহু নির্দেশনা প্রদান করেছেন। মহানবি (স.) সেগুলো আমাদের সামনে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি সেসব বিধান সাহাবিগণকে হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়েছেন। হাদিস জানার মাধ্যমেই আমরা এগুলো জানতে পারি। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمَا أَنْكِمُ الرَّسُولُ فَخْلُوْهُ وَمَا نَهِمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا ج

অর্থ : “রাসূল তোমাদের যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা তোমাদের নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।” (সূরা আল-হাশ্ৰ, আয়াত ৭)

আল্লাহ তায়ালার এ বাণীতে হাদিসের গুরুত্ব ফুটে উঠেছে। অতএব, আমরা হাদিস শরিফ জানব এবং সে অনুযায়ী যথাযথভাবে আমল করতে চেষ্টা করব।

সিহাহ সিত্তাহ (الصَّحَاحُ السِّتْتُ)

সিহাহ শব্দের অর্থ শুন্ধ, সঠিক। আর সিত্তাহ শব্দের অর্থ ছয়। বিশুন্ধ ছয়টি হাদিস গ্রন্থকে একত্রে সিহাহ সিত্তাহ বলা হয়। প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সহিহ হাদিসসমূহ এ ছয়টি গ্রন্থে একত্র করা হয়েছে। এগুলোর সাহায্যে আমরা নির্ভরযোগ্য বর্ণনার মাধ্যমে মহানবি (স.)-এর হাদিসসমূহ জানতে পারি।

নিম্নে আমরা উক্ত ছয়টি হাদিস গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানব :

১. সহিহ বুখারি

এ গ্রন্থের সংকলক হলেন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারি (র.)। তিনি ইমাম বুখারি নামে খ্যাত। তাঁর নামানুসারেই তাঁর সংকলিত কিতাবকে সহিহ বুখারি বলা হয়। তিনি সর্বমোট ছয় লক্ষ হাদিস থেকে যাচাই-বাছাই করে তাঁর কিতাব সংকলন করেন। এটি ৩০ পারায় বিভক্ত। সহিহ বুখারি সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হাদিস গ্রন্থ। বলা হয়, কুরআন মজিদের পর সর্বাধিক বিশুন্ধ গ্রন্থ হলো সহিহ বুখারি।

২. সহিহ মুসলিম

এটি সিহাহ সিত্তাহর দ্বিতীয় গ্রন্থ। বিশুন্ধতার দিক থেকে সহিহ বুখারির পরই এর স্থান। এ গ্রন্থের সংকলক হলেন আবুল হুসাইন মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল কুশাইরি (র.)। তিনি তিন লক্ষ হাদিস থেকে বাছাই করে এ কিতাব সংকলন করেন।

৩. জামি তিরমিয়ি

এ কিতাবের সংকলক আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিয়ি (র.)। এ কিতাবে প্রায় সব বিষয়ের হাদিস সংকলন করা হয়েছে। এ কিতাব সম্পর্কে বলা হয়- ‘যার ঘরে এ কিতাব থাকবে, মনে করা যাবে যে তার ঘরে নবি করিম (স.) আছেন এবং তিনি নিজে কথা বলছেন।’

৪. সুনানে আবু দাউদ

এ কিতাবের সংকলকের নাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবন আশআছ (র.)। এ কিতাবের বিন্যাস পদ্ধতি অত্যন্ত উন্নতমানের। সর্বমোট ৫ লক্ষ হাদিস যাচাই-বাছাই করে এ কিতাব সংকলন করা হয়।

৫. সুনানে নাসাই

এর সংকলক আহমদ ইবন শুআইব আন-নাসাই (র.)। এর বিন্যাস পদ্ধতি উচ্চমানের। সিহাহ সিত্তাহের মধ্যে এ কিতাব খানার বিশেষ মর্যাদা রয়েছে।

৬. সুনানে ইবনে মাজাহ

এটি সিহাহ সিত্তাহের সর্বশেষ কিতাব। এর সংকলকের নাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযিদ ইবনে মাজাহ।

আমরা বড় হয়ে হাদিসের এসব কিতাব পড়ব। এগুলো থেকে প্রিয় নবি (স.)-এর বাণী ও কর্ম সম্পর্কে জ্ঞান-লাভ করব। অতঃপর এগুলোর শিক্ষা অনুসারে নিজের জীবন পরিচালনা করব।

দলীয় কাজ : হাদিসের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

বাড়ির কাজ : শিক্ষার্থী ছয়টি বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থ ও এগুলোর সংকলকগণের নাম নিজ খাতায় লিখে একটি চার্ট তৈরি করবে।

পাঠ ১৩

মুনাজাতমূলক তিনটি হাদিস

মুনাজাত হলো আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রার্থনা করা। মুনাজাত করার দ্বারা আল্লাহ তায়ালার মহানত্ত্ব প্রমাণিত হয়। কেননা যে ব্যক্তি দুর্বল, অসহায় সেই সাধারণত সাহায্য চায়। আর সাহায্যকারী স্বভাবতই ক্ষমতাবান ও শক্তিশালী হয়ে থাকে। মহান আল্লাহর নিকট মুনাজাতের মাধ্যমে আমরা আমাদের দুর্বলতা ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করি। সাথে সাথে আল্লাহ তায়ালার অমুখাপেক্ষিতা, ক্ষমতা, দয়া ইত্যদি গুণের স্বীকৃতি প্রদান করি। সুতরাং মুনাজাতও একপ্রকার ইবাদত। এর দ্বারা আল্লাহ তায়ালা খুশি হন। হাদিস শরিফে মুনাজাতমূলক বহু হাদিস রয়েছে। নিম্নে আমরা মুনাজাতমূলক তিনটি হাদিস জানব।

হাদিস ১

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالْتَّقْوَى وَالْعَفَافَ وَالْغِفَافَ -

অর্থ : ‘হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট হিদায়াত (সরল সঠিক পথের নির্দেশনা), তাকওয়া বা পরহেয়গারি, পবিত্রতা ও অভাব-অন্টন থেকে মুক্তি কামনা করছি।’ (সহিহ মুসলিম ও জামি তিরমিয়ি)

হাদিস ২

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَاعْفُنِي وَارْزُقْنِي -

অর্থ : ‘হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি দয়া প্রদর্শন কর, আমাকে (সরল সঠিক) পথ দেখাও, আমাকে নিরাপদে রাখ এবং আমাকে রিযিক দান কর।’ (সহিহ মুসলিম)

হাদিস ৩

يَا مَقْلِبَ الْقُلُوبِ ثِبْتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ

অর্থ : ‘হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী! তুমি আমার অন্তরকে তোমার দীনের (ইসলামের) উপর দৃঢ় রাখ।’
(জামি তিরমিয়ি)

দীনের উপর দৃঢ়-স্থির থাকা মুমিনের জন্য সৌভাগ্যের ব্যাপার। উল্লিখিত হাদিসে আল্লাহ তায়ালার নিকট এ ব্যাপারে সাহায্য প্রার্থনা করা হয়েছে।

আমরা উপরিউক্ত মুনাজাতসমূহ শিখব। এগুলোর অর্থ জানব। অতঃপর এগুলোর দ্বারা আন্তরিকভাবে আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রার্থনা করব। তাহলে আল্লাহ তায়ালা খুশি হবেন। আমাদের ক্ষমা করবেন এবং দয়া করবেন। এভাবে আমরা দুনিয়া ও আধিকারাতে কল্যাণ লাভ করব।

দলীয় কাজ : শিক্ষার্থীরা মুনাজাতমূলক তিনটি হাদিসের অর্থ একটি পোস্টারে লিখবে এবং
শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ১৪

নেতৃত্ব গুণাবলি বিষয়ক তিনটি হাদিস

মানবপ্রেম ও পরমতসহিষ্ণুতা দুটি মহৎ গুণ। আমাদের সমাজে নানারকম লোকজন বসবাস করে। ধনী-গরিব, সাদা-কালো, সুস্থ-অসুস্থ, হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সবরকমের লোকদের নিয়েই আমাদের সমাজ। সবাই এ সমাজের সদস্য। সবার মিলিত প্রচেষ্টায় সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। সবার মধ্যে গ্রেক্য ও সহযোগিতা না থাকলে কোনো সমাজ উন্নতি লাভ করতে পারে না। আর এর জন্য প্রয়োজন মানুষের প্রতি প্রীতি, দয়া-মায়া, ভালোবাসা। ইসলাম ধর্মে এগুলোর প্রতি খুবই গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আমাদের মহানবি (স.) নিজে সকল মানুষকে ভালোবাসতেন। জাতি- ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সাথে সম্বন্ধবহার করতেন। আত্মীয়-অনাত্মীয়, পরিচিত-অপরিচিত সবাইকেই তিনি ভালোবাসতেন, সবার প্রতি দয়া করতেন। আমাদের তিনি এরূপ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। হাদিস শরিফে আমরা তাঁর এসব নির্দেশ দেখতে পাই।

আমাদের সমাজে মুসলমানগণের পাশাপাশি অমুসলিমগণও বসবাস করে। তারাও আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি। তাঁদের প্রতিও সদাচরণ করতে হবে। তাঁদের ধর্ম ও বিশ্বাসের প্রতি কোনোরূপ ঠাট্টা-তামাশা করা যাবে না। তাঁদেরকে স্বাধীনভাবে নিজ ধর্ম পালন করতে দিতে হবে। এটাই হলো মহানবি (স.) ও দীন ইসলামের শিক্ষা। হাদিস শরিফে এ সম্পর্কেও আমাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ পাঠে আমরা মানবপ্রেম ও পরমতসহিষ্ণুতা-সংক্রান্ত তিনটি হাদিস জানব।

হাদিস ১

لَا يَرْكِمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْكِمُ النَّاسَ -

অর্থ: 'যে মানুষের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে না, আল্লাহ তায়ালাও তার প্রতি দয়া করেন না।' (সহিহ্ বুখারি ও সহিহ্ মুসলিম)

শিক্ষা

পৃথিবীর সকল মানুষ মহান আল্লাহর সৃষ্টি। সকলের প্রতিই সদাচার করতে হবে। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের প্রতি দয়া-মায়া, ভালোবাসা দেখাতে হবে। এমন যেন না হয় যে আমরা শুধু ধনীদের ভালোবাসব, গরিবদের ভালোবাসব না। অদ্রপ অমুসলিমদেরকে বাদ দিয়ে শুধু মুসলিমদের সাহায্য-সহযোগিতা করাও ঠিক নয়। বরং প্রয়োজন অনুসারে সকলের প্রতিই দয়া, ভালোবাসা ও সহযোগিতা করতে হবে। তাহলে আল্লাহ তায়লা খুশি হবেন এবং আমাদের প্রতি দয়া করবেন। সকল মানুষকে ভালোবাসা ও শুন্দৰ করাই এ হাদিসের শিক্ষা।

হাদিস ২

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رِحْمٍ -

অর্থ : ‘আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না’ (সহিহ্ বুখারি ও সহিহ্ মুসলিম)

শিক্ষা

আত্মীয়স্বজনের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করতে হবে। মা-বাবা, ভাই-বোন, খালা-খালু, ফুফু-ফুফা, দাদা-দাদি, নানা-নানি সকলেই আমাদের আত্মীয়। তারা আমাদের একান্ত আপনজন। এছাড়া আমাদের আরও বহু আত্মীয়স্বজন রয়েছেন। সকলের সাথেই আমরা সম্পর্ক রক্ষা করে চলব। কারো সাথেই সম্পর্ক ছিন্ন করব না।

আত্মীয়-পরিজন যদি অমুসলিমও হন তাঁদের সাথেও সম্পর্ক ত্যাগ করা যাবে না। বরং তাঁদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। সদাচার করতে হবে। প্রয়োজনে সাহায্য-সহযোগিতা করতে হবে। বিপদে-আপদে তাঁদের পাশে দাঁড়াতে হবে। আমরা সকল আত্মীয়ের সাথে সুন্দর সম্পর্ক রাখব। তবেই আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব।

হাদিস ৩

أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوْ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوَقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخْذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَإِنَّا لِجِنِّيَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

অর্থ : ‘সাবধান! কেউ যদি কোনো যিন্মির প্রতি মূলুম করে অথবা তাকে তার অধিকার থেকে কম দেয় কিংবা ক্ষমতাবহির্ভূত কোনো কাজ তার উপর চাপিয়ে দেয় বা জোরপূর্বক তার থেকে কোনো মালামাল নিয়ে যায়, তাহলে কিয়ামতের দিন আমি তার (যিন্মির) পক্ষ অবলম্বন করব।’ (আবু দাউদ)

শিক্ষা

মুসলিম-অমুসলিম সকলেই এ দেশের নাগরিক। মুসলিম-অমুসলিমগণের প্রতি কোনোরূপ অন্যায়-অত্যাচার করা যাবে না।

তাদের ধর্ম, জীবন, ধন-সম্পদ, সম্মত ইত্যাদির ক্ষতি করা যাবে না। শান্তিপূর্ণভাবে ধর্মপালনে তাদের কোনোরূপ বাধা দেওয়া যাবে না। তাদের ধর্ম নিয়ে কোনোরূপ অবহেলা প্রদর্শন করা যাবে না। তাদের সাথে উত্তম আচরণ করতে হবে। তাদের প্রতি সহিষ্ণুতা ও সহমর্মিতা প্রদর্শন করতে হবে। কেননা তাদের প্রতি অত্যাচার করলে, কষ্ট দিলে স্বয়ং নবি করিম (স.) কিয়ামতের দিন আমাদের পক্ষে সুপারিশ করবেন না। আর মহানবি (স.) কারো পক্ষে সুপারিশ না করলে তার ধৰ্ম অনিবার্য। সুতরাং আমরা সকল মানুষকে ভালোবাসব। কাউকে কষ্ট দেবো না, কারো প্রতি অত্যাচার-নির্যাতন করব না। সমাজের সকলকে ধর্ম পরিচয়ে নয়, মানুষ হিসেবে বিবেচনা করে সকলের সাথে সম্ভাব বজায় রাখব।

বাড়ির কাজ : শিক্ষার্থী এ পাঠে উদ্ধৃত হাদিস তিনটি অর্থসহ মুখ্য বলবে।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. জামিউল কুরআন অর্থ |
২. দেখে দেখে তিলাওয়াত করাকে তিলাওয়াত বলে।
৩. মৃত্যুর পর মানুষ বুঝতে পারবে।
৪. আবু লাহাব ছিল ও এর শক্তি।
৫. মুসলিমদের ন্যায় অমুসলিমগণও |

বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর

বাম পাশ	ডান পাশ
১. একত্ববাদের প্রমাণ	সূরা আদিয়াত।
২. আল-কুরআনের ১০০তম সূরা	ওয়াক্ফ।
৩. স্থগিত রাখা	হযরত উমর (রা)-এর।
৪. মাদ্দে আসলি	সূরা ইখলাস।
৫. আল-কুরআন সংকলনের পরামর্শ	মূল মাদ্দ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. তাজবিদ কাকে বলে?
২. নাখিরা তিলাওয়াত বলতে কী বোঝায়?
৩. সিহাহ সিন্তাহ কী?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. কুরআন মজিদের গুরুত্ব বর্ণনা কর।
২. কুরআন মজিদ সংকলনের ইতিহাস বর্ণনা কর।
৩. সূরা আল-ইখলাসের শানে নুযুল ও শিক্ষা বর্ণনা কর।
৪. হাদিস কাকে বলে? হাদিসের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মাদ্দের হরফ কয়টি?

- | | |
|---------|---------|
| ক. ৩টি | খ. ৬টি |
| গ. ১৪টি | ঘ. ১৫টি |

২. তোমরা কুরআন পাঠ কর, কেননা কুরআন পাঠকের জন্য সুপারিশ করবে। হাদিসের উদ্দেশ্য—

- i. কুরআন পাঠের গুরুত্ব বর্ণনা করা
- ii. তাজবিদসহ কুরআন তিলাওয়াত করা
- iii. নিজে কুরআন শিক্ষা করা ও অপরকে শেখানো

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-----------|----------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. i ও ii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উভয় দাও

এরফান নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করে কিন্তু তার তিলাওয়াত শুন্দি হয় না। একবার ট্ৰি' (নুহন) শব্দ তিলাওয়াতের সময়ে ৳ (নুন) বর্ণকে টেনে পড়েনি।

৩. এরফান এক্ষেত্রে কি ত্যাগ করেছে?

- | | |
|------------|----------|
| ক. ওয়াক্ফ | খ. মাদ্দ |
| গ. মাখরাজ | ঘ. সিফাত |

৪. এরফানের এ জাতীয় তিলাওয়াতে —

- i. সালাত শুন্দি হবে না
- ii. অর্থ পরিবর্তন হয়ে যাবে
- iii. গুনাহ হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i | খ. i ও ii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। নাবিহা প্রতিদিন কুরআন তিলাওয়াত করে। মেয়ের তিলাওয়াত শোনার জন্য বাবা মাওলানা আহমাদ সাহেব নাবিহার কাছে বসলেন। নাবিহা তিলাওয়াত শুন্ন করল। এবার তিলাওয়াতের সময়ে ১ (মিম) চিহ্ন বিরতি দেয় নি, ৫ (ফিঝ) তিলাওয়াতের সময়ে ফ বর্ণ এবং ৯ বর্ণ দীর্ঘ করে পড়েনি। মেয়েকে উদ্দেশ্য করে নাবিহার বাবা বললেন, কুরআন মজিদ সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ আসমানি গ্রন্থ। এর সংরক্ষণ ও সংকলন নির্ভুল ও সন্দেহাতীত পন্থায় হয়েছে। তাই এর তিলাওয়াতও নির্ভুল হওয়া আবশ্যিক।

ক. ‘মাখরাজ’ শব্দের অর্থ কী?

খ. তাজবিদ বলতে কী বোঝায়?

গ. নাবিহা দ্বিতীয় পর্যায়ে কোন বিষয়টি ত্যাগ করেছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মাওলানা আহমাদ সাহেব মেয়ে নাবিহাকে যে বিষয়টির প্রতি তাঁর দিয়েছেন তার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

২। আকরাম সাহেব একজন বিশিষ্ট সমাজপতি। একদিন তাঁর অসুস্থ প্রতিবেশী মনির মিয়া চিকিৎসার জন্য কিছু সাহায্য চাইলে তিনি তাঁকে তাড়িয়ে দেন। অপরদিকে আকরাম সাহেবের বন্ধু আফজাল সাহেব তাঁর অসহায় ফুফার মেয়ের বিবাহের যাবতীয় খরচ বহন করেন।

ক. বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থ কয়টি?

খ. ‘মানবপ্রেম একটি মহৎগুণ’-ব্যাখ্যা কর।

গ. সাহায্যপ্রার্থী মনির মিয়ার প্রতি আকরাম সাহেবের আচরণে কী লঙ্ঘিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. আফজাল সাহেবের কাজটি পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

চতুর্থ অধ্যায়

আখলাক (الْخُلُقُ الْأَكْرَمُ)

আখলাক আরবি শব্দ। এর অর্থ চরিত্র, স্বভাব, আচার-আচরণ, ব্যবহার ইত্যাদি। মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্মের মাধ্যমে যেসব আচার, ব্যবহার, চালচলন এবং স্বভাবের প্রকাশ পায়, সেসবের সমষ্টিই হলো আখলাক। এককথায় মানবচরিত্রের সব দিকই আখলাকের অন্তর্ভুক্ত। মানবচরিত্রের সৎ ও অসৎ দিকগুলোর বিচারে আখলাককে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। আখলাকে হামিদাহ্ (প্রশংসনীয় আচরণ) এবং আখলাকে যামিমাহ্ (নিন্দনীয় আচরণ)

এ অধ্যায় শেষে আমরা –

- সদাচরণের পরিচয় ও কতিপয় সদাচরণের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- অসদাচরণের পরিচয় ও এর কুফল বর্ণনা করতে পারব।
- ইসলামের দৃষ্টিতে ইভিটিজিং ও ছিনতাইয়ের (রাহাজানি) নেতৃত্বাচক প্রত্যাব এবং প্রতিকারের উপায় বর্ণনা করতে পারব।

পাঠ ১

আখলাকে হামিদাহ্ (الْخُلُقُ الْأَكْرَمُ)

মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্মের মাধ্যমে যেসব উত্তম আচার, ব্যবহার, চালচলন এবং স্বভাবের প্রকাশ পায়, সেসবের সমষ্টিকে আখলাকে হামিদাহ্ বা উত্তম চরিত্র বলা হয়। যেমন- পরোপকারিতা, শালীনতাবোধ, সৃষ্টির সেবা, আমানত রক্ষা, শ্রমের মর্যাদা, ক্ষমা ইত্যাদি।

আখলাকে হামিদাহ্ গুরুত্ব

মানবজীবনে আখলাকে হামিদাহ্ (উত্তম চরিত্রের) গুরুত্ব অপরিসীম। মানবজীবনের সুখ-শান্তি আখলাকে হামিদাহ্ বা প্রশংসনীয় আচরণের উপর নির্ভরশীল। প্রশংসনীয় আচরণের মাধ্যমেই উত্তম চরিত্র গড়ে ওঠে। আধিরাতের সুখ-দুঃখও আখলাকে হামিদাহ্ উপর নির্ভর করে। যার স্বভাব-চরিত্র যত সুন্দর হবে, সে ততই সত্ত্বরশীল হবে এবং আল্লাহর কাছে স্থিয় হবে।

আখলাকে হামিদাহ্ সুফল

১. মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসা লাভ

উত্তম চরিত্রের অধিকারী হলে মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স.)-এর সত্ত্বাঙ্গ অর্জন করা যায়। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, ‘তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি আমার নিকট অধিক স্থিয়, যার চরিত্র সর্বোত্তম।’ (বুখারি ও মুসলিম)

২. ইমানের পূর্ণতা অর্জন

উভয় চরিত্র মানুষের ইমানকে পূর্ণতা দান করে। এ সম্পর্কে মহানবি (স.) বলেন,

- أَكُلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنْهُمْ خُلْقًا -

অর্থ : ‘চরিত্রের বিচারে যে উভয়, মুমিনদের মধ্যে সেই পূর্ণতম ইমানের অধিকারী।’ (আবু দাউদ)

৩. সর্বোত্তম মর্যাদা লাভ

উভয় চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স.)-এর নিকট উঁচু মর্যাদা লাভ করেন এবং সমাজের নিকটও উঁচু মর্যাদার অধিকারী হন। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, ‘তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ, যার চরিত্র উভয়।’ (বুখারি)

৪. জাহান্নাম থেকে পরিদ্রাণ লাভ

মহান আল্লাহ উভয় চরিত্রবান ব্যক্তিকে জাহান্নামের আগুন থেকে রেহাই দেবেন। এ প্রসঙ্গে মহানবি (স.) বলেন, ‘আল্লাহ তায়ালা যার গঠন ও স্বভাব সুন্দর করেছেন, দোষখের অগ্নি তাকে ভক্ষণ করবে না।’ (তাবারানি ও বায়হাকি)

দলীয় কাজ : আখলাকে হামিদাহ্র সুফলগুলো উল্লেখ কর।
বাড়ির কাজ : সদাচারণের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

পাঠ ২

পরোপকার (الْحُسَانُ)

মানুষ সামাজিক জীব হিসেবে সমাজবন্ধ হয়ে বসবাস করে। আর সমাজবন্ধ হয়ে বসবাস করতে হলে পরস্পরের সহযোগিতার প্রয়োজন। অন্যের প্রয়োজনে বা উপকারে আসার নামই হলো পরোপকার।

পরোপকারের আরবি প্রতিশব্দ হলো ‘ইহসান’ *إِحْسَانٌ*, যার অর্থ অন্যের উপকার করা। আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি মানুষের যে দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে সেগুলোকে উভয় বা যথাযথভাবে পালন করার নামই পরোপকার।

তাৎপর্য

পরোপকার মহান আল্লাহর একটি বড় গুণ। মহান আল্লাহ পরম দয়ালু। সমগ্র সৃষ্টির প্রতি তাঁর এ অসীম দয়া ও করুণা বিরাজমান। তিনি সকল মানুষকে সমান যোগ্যতা ও দক্ষতা দিয়ে সৃষ্টি করেননি। এ কারণে মানুষ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। তাই মানুষ সাধ্য ও সামর্থ্য অনুযায়ী অপরের উপকার করতে হবে।

পরোপকারের সুফল

১. আল্লাহর ভালোবাসা লাভ

পরোপকারী ব্যক্তিদের আল্লাহ তায়ালা ভালোবাসেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

অর্থ : “তোমরা সৎকর্ম ও পরোপকার কর। নিচয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীল ও পরোপকারীদেরকে ভালোবাসেন।”
(সূরা আল-বাকারা, আয়াত - ১৯৫)

২. সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়

পরোপকারের মাধ্যমে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্পদ ব্যয় করে বা ভালো কথা বলেও মানুষের উপকার করা যায়। এতে সমাজ থেকে ঝগড়া-ফাসাদ দূর হয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩. শত্রু মিত্রে পরিণত হয়

পরম শত্রুকেও পরোপকারের মাধ্যমে আপন করা যায়। কঠোর হৃদয়বিশিষ্ট লোকের অন্তরও জয় করা যায়।

৪. আল্লাহর রহমত লাভ

আল্লাহর কোনো সৃষ্টির প্রতি দয়া করলে তিনি দয়াকারী ব্যক্তির উপর রহমত বর্ষণ করেন। এ সম্পর্কে মহানবি (স.)-এর হাদিস –

إِذْ حُمُّرٌ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُرْجَحُ كُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ

অর্থ : ‘তোমরা জমিনের অধিবাসীদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবে। তাহলে আসমানের অধিপতি মহান আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।’ (তিরমিয়ি)

৫. মানুষের ভালোবাসা অর্জন

দয়া বা পরোপকারের মাধ্যমে মানুষের ভালোবাসা পাওয়া যায়। সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। সামাজিক বন্ধন মজবুত হয়। কঠিন হৃদয়ের মানুষকে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করা যায়। পরম শত্রুও মিত্রতে পরিণত হয়।

আমরা সর্বদা সৃষ্টির সেবা করব। বিপদে-আপদে অপরের সাহায্য করব।

দলীয় কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে মানুষকে কীভাবে উপকার করা যায় তার একটি তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ ৩

শালীনতাবোধ (الْتَّهْذِيبُ)

শালীনতার আরবি প্রতিশব্দ ‘তাহযিব’ (تَهْذِيبٌ), যার অর্থ ভদ্রতা, নন্দতা ও লজ্জাশীলতা। আচার-আচরণে, কথাবার্তায়, বেশভূষায় ও চালচলনে মার্জিত পন্থা অবলম্বন করাকে শালীনতা বলে।

গুরুত্ব

শালীনতা মানুষের একটি মহৎগুণ। এটির গুরুত্ব অপরিসীম। শালীনতাবোধ মানুষকে অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে। শালীনতা আল্লাহর অনুগত বান্দা হতে সাহায্য করে। আচার-ব্যবহারে শালীন ব্যক্তিকে সবাই পছন্দ করে। শালীন পোশাক-পরিচ্ছদ সৌন্দর্যের প্রতীক। শালীন ও ভদ্র আচরণের মাধ্যমে বশ্যুত্ত ও হৃদ্যতা সৃষ্টি হয়। সমাজকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল রাখতে শালীনতার প্রয়োজন সর্বাধিক। শালীনতাপূর্ণ আচার-ব্যবহার সম্পূর্ণ ও সৌহার্দের চাবিকাঠি। অশোভন বা অশালীন পোশাক-পরিচ্ছদ ও আচরণ অনেক সময় সমাজে বিপর্যয় ডেকে আনে, সমাজে অশান্তির সৃষ্টি করে। নেতৃত্বে চরিত্রের অবক্ষয় ঘটায়।

শালীনতাপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে বশ্যুত্ত গড়ে উঠে। পক্ষান্তরে অভদ্র বা অশালীন আচরণ বশ্যুকেও দূরে ঠেলে দেয়। মানুষ অশালীন ব্যক্তিকে পছন্দ করে না। তার সাহচর্য পরিত্যাগ করে। মহানবি (স.) বলেন, ‘মানুষের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে নিকৃষ্ট, যার অশ্লীলতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য লোকেরা তাকে পরিত্যাগ করে।’ (বুখারি) অশালীন ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা কখনোই পছন্দ করেন না। বরং অশালীন ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা ঘৃণা করেন। এ সম্পর্কে মহানবি (স.)-এর বাণী :

إِنَّ اللَّهَ يَبْغُضُ الْفَاحِشَ الْبَلِّيَّ -

অর্থ : ‘নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা অশালীন ও দুর্চরিত ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন।’ (তিরমিয়ি)

শালীনতা মানুষের জীবনে অপরিহার্য বিষয়। মহান আল্লাহ আমাদেরকে শালীনতা শিক্ষা দিয়েছেন। পরিত্র কুরআনের সূরা লুকমানে উল্লেখ আছে যে, হ্যরত লুকমান (আ.) তাঁর পুত্রকে শালীনতা শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেন, “হে পুত্র, অহংকার বশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না। পৃথিবীতে উদ্ধৃতভাবে চলো না, কারণ আল্লাহ কোনো উদ্ধৃত অহংকারী ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না। তুমি পদচারণ করবে সংযতভাবে এবং তোমার কর্তৃত্বের নিচু করবে। নিশ্চয়ই স্বরের মধ্যে গাধার স্বর সর্বাপেক্ষা অপ্রতিকর।” (সূরা লুকমান, আয়াত ১৯)

শালীনতার গুরুত্ব অপরিসীম। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শালীনতা অবলম্বন করে চলা উচিত। এতে জীবন সুন্দর ও মধুময় হয়ে উঠে। সমাজেও সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

দলীয় কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে শালীন আচরণের সুফলগুলো পোস্টারে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

বাড়ির কাজ : ‘অশালীন পোশাক-পরিচ্ছদ ও আচরণ বিপর্যয় ডেকে আনে।’ - ব্যাখ্যা কর।

পাঠ ৪

সৃষ্টির সেবা (خُلُقُ الْحَكِيمِ)

ইসলামি পরিভাষায় আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি দয়া ও সহানুভূতিশীল হয়ে আদর-যত্ন করার নামই হলো সৃষ্টির সেবা। মহান আল্লাহ এই সুন্দর পৃথিবীতে মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির সেরা করে পাঠিয়েছেন। আর সৃষ্টিকুলের সবকিছু যেমন- জীবজন্তু, পশু-পাখি, কীটপতঙ্গ, পাহাড়-পর্বত, গাছগালা ইত্যাদি মানুষের উপকারের জন্য সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং এসব সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি দেখানো এবং এগুলোর যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা অবশ্য কর্তব্য।

গুরুত্ব

যে সৃষ্টির প্রতি দয়া ও সহানুভূতি প্রদর্শন করে, আল্লাহ তার প্রতি খুশি হয়ে রহমত বর্ষণ করেন। এ সম্পর্কে মহানবি (স.) বলেন,

إِنَّمَا مَنِ اتَّقَى الْأَرْضَ يَرَهُمُ كُمَّ مَنْ فِي السَّمَاءِ -

অর্থ : ‘তোমরা জমিনের অধিবাসীদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবে। তাহলে আসমানের অধিপতি মহান আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।’ (তিরমিয়ি)

পৃথিবী ও এই মহাবিশ্বে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহর সৃষ্টি। সৃষ্টিজগতের সবকিছু নিয়ে আল্লাহর সৃষ্টি পরিবার। আল্লাহর সৃষ্টি পরিবারে মানুষই সেরা সৃষ্টি। পরিবারে যেমন পরিবার প্রধানের অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকে, তেমনি সৃষ্টিজগতের প্রতিও মানুষের অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। সৃষ্টিকুলের প্রতি এ দায়িত্ব পালন করার নাম সৃষ্টির সেবা।

মানুষের উপর প্রধানত দুই ধরনের কর্তব্য রয়েছে। প্রথমত স্বীকৃতির প্রতি কর্তব্য, তারপর সৃষ্টির প্রতি কর্তব্য। সৃষ্টির প্রতি মানুষের কর্তব্যগুলোর মধ্যে অসহায় ও দুস্থ মানুষকে সাহায্য ও সহযোগিতা করা যেমন কর্তব্য, তেমনি গাছগালা, পশু-পাখি, বৃক্ষলতা এবং পরিবেশের প্রতিও মানুষের কর্তব্য রয়েছে। সৃষ্টির প্রতি সদয় হলো এবং এদের লালনপালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করলে আল্লাহ খুশি হন। তেমনি এদের প্রতি অবহেলা করলে, নিষ্ঠুর আচরণ করলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। এ সম্পর্কে মহানবি (স.)-এর হাদিস হলো-

أَخْلَقُ عِبَادَ اللَّهِ - فَأَحَبَّ أَخْلَقَ إِلَيْهِ اللَّهُ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهِ عِبَادَهُ

অর্থ : ‘সমগ্র সৃষ্টিজগৎ আল্লাহর পরিবার, আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তিই প্রিয়, যে তার পরিবারের প্রতি বেশি অনুগ্রহ করেন।’ (মিশকাত)

আমাদের চার পাশের কীটপতঙ্গ, গাছগালা, তরুলতা, পশু-পাখি সবকিছুর প্রতি মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। কারণ এ সবকিছু নিয়েই আমাদের পরিবেশ। আমাদের স্বার্থেই এ পরিবেশ রক্ষা করতে হবে। মহান আল্লাহ এ সবকিছু আমাদের উপকারের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আমাদের প্রিয় নবি (স.) সৃষ্টিজীবের প্রতি সর্বদা সদয় ছিলেন।

সমাজে কোনো ব্যক্তি পীড়িত হলে তার সেবা করতে হবে। খণ্ডস্ত ব্যক্তির ঝণ পরিশোধের ব্যবস্থা করতে হবে। এভাবে সমাজে একে অপরের সেবা ও সাহায্য করলে আল্লাহর অনুগ্রহ পাওয়া যায়। প্রিয় নবি (স.) বলেছেন, ‘যে মুসলমান অন্য মুসলমান ভাইয়ের অভাব মোচন করে আল্লাহ তায়ালা তার অভাব দূর করেন।’ (মুসলিম)

গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি সকল প্রাণীরই আমাদের ন্যায় ক্ষুধা ও পিপাসা আছে। এদেরকে খেতে দেওয়া আমাদের দায়িত্ব।

মহানবি (স.) বলেন, ‘কোনো এক মহিলা একটি বিড়াল বেঁধে রাখে। সে বিড়ালটিকে খেতে দেয়নি এবং ছেড়ে দেয়নি যাতে পোকামাকড় খেয়ে জীবনধারণ করতে পারে। অবশেষে বিড়ালটি বাঁধা অবস্থায় খাদ্যাভাবে মারা গেলে আল্লাহ ঐ মহিলাকে শান্তি দেন।’ (বুখারি ও মুসলিম)

প্রিয় নবি (স.) আরও বলেন, ‘বনি ইসরাইলের এক পাপী মহিলা একটি তৃক্ষণাত্মক কুকুরকে পিপাসায় কাতর দেখে পানি পান করায়। এতে আল্লাহ তায়ালা ঐ মহিলার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাকে ক্ষমা করে দেন।’ (বুখারি ও মুসলিম)

জীবজন্মের মতো উদ্ধিদের প্রতিও সদয় হতে হবে। অকারণে গাছ কাটা উচিত নয়। গাছের পাতা ছেঁড়া বা চারাগাছ উপরে ফেলাও উচিত নয়। গাছপালার যত্ন করা উচিত। বৃক্ষলতাও মহান আল্লাহর তাসবিহ পাঠ করে। পরিবেশ রক্ষায় ও নিজেদের প্রয়োজনে জীবজগৎ ও পরিবেশের প্রতি সদাচরণ করা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

আমরা সৃষ্টির সেবা করব, জীবজন্মকে কষ্ট দেবো না। অকারণে কোনো বৃক্ষের ক্ষতি করব না। বৃক্ষরোপণ করব এবং এর যত্ন করব।

দলীয় কাজ : শিক্ষার্থীরা নিজেদের মধ্যে কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে সৃষ্টির সেবামূলক কাজগুলোর একটি তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ ৫

আমানত (‘আমানত)

আমানত অর্থ গচ্ছিত রাখা বা দায়িত্বে রাখা। গচ্ছিত বা দায়িত্বে রাখা বস্তু স্বত্ত্বে রেখে এর মালিকের কাছে যথাযথভাবে ফেরত দেওয়াকে আমানত রক্ষা বলে। যিনি আমানত রক্ষা করেন, তাকে আমানতদার বলে। আমানতের মাল নষ্ট করা বা আত্মসাংকেতিক করার নাম খেয়ানত করা। আর আত্মসাংকেতিক করার নাম গুরুত্বারূপ করেন।

গুরুত্ব

সমাজের প্রতিটি মানুষের নিজ নিজ দায়িত্ব তার নিকট পবিত্র আমানত। সামাজিক শান্তি রক্ষার জন্য আমানত রক্ষা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যিনি আমানত রক্ষা করেন, তাকে সবাই বিশ্বাস করে এবং ভালোবাসে। সমাজের সবাই তাকে মর্যাদা দেয়। আমানতের খেয়ানতকারীকে সমাজের কেউ পছন্দ করে না এবং বিশ্বাসও করে না।

বরং তাকে সবাই ঘৃণা করে। আমানত রক্ষার প্রতি গুরুত্বারূপ করে মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْنِيَّةَ إِلَىٰ أَهْلِهَا لَا

অর্থ: “নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যে তোমরা যেন আমানতসমূহ তার মালিককে যথাযথভাবে ফেরত দাও।” (সূরা আন-নিসা, আয়াত ৫৮)

আমানত রক্ষা করা ইমানের অঙ্গ। এ ব্যাপারে মহানবি (স.) বলেন,

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ

অর্থ: ‘যার আমানতদারি নেই, তার ইমানও নেই।’ (বাযহাকি)

আমানতের খেয়ানত করা মুনাফিকের লক্ষণ।

মহানবি (স.) বলেন,

أَيْةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذِبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُوْتِمَنَ خَانَ -

অর্থ: ‘মুনাফিকের চিহ্নটি, যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে, আমানতের খেয়ানত করে।’ (বুখারি ও মুসলিম)

আমানতের খেয়ানতকারী ব্যক্তি আল্লাহর কাছে ঘৃণিত। মানুষের কাছেও ঘৃণিত। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার বাণী:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ۝

অর্থ: “নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা খেয়ানতকারীদের পছন্দ করেন না।” (সূরা আল-আনফাল, আয়াত ৫৮)

দলীয় কাজ : শিক্ষার্থীরা দলভিত্তিক আলোচনা করে আমানত রক্ষার কয়েকটি ক্ষেত্রের তালিকা প্রস্তুত করবে।

পাঠ ৬

শ্রমের মর্যাদা (شَرْفُ الْعَمَلِ)

মানুষ জীবনধারণের জন্য যেসব কাজ করে তাকে শ্রম বলে। মানুষ তার নিজের বেঁচে থাকার, অপরের কল্যাণের এবং সৃষ্টি জীবের উপকারের জন্য যে কাজ করে তাই শ্রম। মানুষের উন্নতির চাবিকাঠিই হলো শ্রম। যে জাতি যত বেশি পরিশৰ্মী সে জাতি তত বেশি উন্নত। শ্রমের ব্যাপারে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে নির্দেশ দিয়েছেন,

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَاتَّشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

অর্থ : “অতঃপর যখন নামায শেষ হবে তখন তোমরা জমিনের বুকে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (রিজিক) অব্বেষণ করবে।” (সূরা আল-জুমুআ, আয়াত ১০)

শ্রমের মর্যাদা

ইসলামে শ্রমের মর্যাদা অত্যধিক। শ্রম দ্বারা অর্জিত খাদ্যকে ইসলাম উৎকৃষ্ট খাদ্য হিসেবে আখ্যা দিয়েছে এবং জীবিকা অন্বেষণকে ইবাদত হিসেবে ঘোষণা করেছে।

এ প্রসঙ্গে মহানবি (স.) বলেন,

ঠَبْ كَسْبُ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ -

অর্থ : ‘ফরজ ইবাদতের পর হালাল বুজি উপার্জন করা একটি ফরজ ইবাদত।’ (বায়হাকি)

মানুষের কল্যাণের জন্য মহান আল্লাহ এ পৃথিবীতে অফুরন্ত সম্পদ রেখেছেন। এ সম্পদগুলো আহরণ করতে হলে প্রয়োজন হয় শ্রমের। শ্রমের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলোও আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টিগতভাবেই দান করেছেন। এগুলো হচ্ছে আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তথা হাত, পা ও মস্তিষ্ক। এগুলোকে কাজে লাগাতে মহান আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন- “তিনি তো তোমাদের জন্য ভূমি সুগম করে দিয়েছেন। কাজেই তোমরা এর দিক-দিগন্তে বিচরণ কর এবং তার দেওয়া রিযিক থেকে আহার কর।” (সূরা আল-মুল্ক, আয়াত ১৫)

আমাদের শ্রিয় নবি (স.) শ্রমকে ভালোবাসতেন। তিনি নিজেও শ্রমে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি শিশু বয়সে মেষ চরাতেন। বড় হয়ে ব্যবসা পরিচালনা করতেন। হিজরতের পর মদিনার জীবনে তিনি বিভিন্ন যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। খন্দকের যুদ্ধে তিনি পরিখা খননে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। পরিশুমী ব্যক্তিকে আল্লাহ পছন্দ করেন। শ্রমিকের মর্যাদা সম্পর্কে মহানবি (স.) বলেন,

الْكَاسِبُ حَبِيبُ اللَّهِ -

অর্থ : ‘শ্রমজীবী আল্লাহর বন্ধু।’ (বায়হাকি)

মহানবি (স.) আরও বলেন, ‘নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য আর নাই। আল্লাহর নবি দাউদ (আ.) নিজের হাতে কাজ করে খেতেন।’ (বুখারি)

শ্রিয় নবি (স.)-এর কল্যাণ হ্যরত ফাতিমা (রা.) নিজ হাতে জাঁতা ঘোরাতেন। আর এজন্য তাঁর হাতে জাঁতা ঘুরানোর দাগ পড়ে গিয়েছিল। এমনিভাবে তিনি নিজেই পানির মশক বয়ে আনতেন। এতে তাঁর বুকে দড়ির দাগ পড়েছিল। ঘরের সকল কাজ তিনি নিজে করতেন। নিজে বাড়ু দিতেন। সাহাবিগণ একদিন নবি করিম (স.)-কে জিজ্ঞাসা করেন, কোন প্রকার উপার্জন উত্তম? নবি করিম (স.) জবাবে বলেন, ‘মানুষের নিজ হাতের কাজের বিনিময় এবং সৎ ব্যবসায় থেকে প্রাপ্ত মুনাফা।’ (সুনানে আহমাদ)

সর্বশ্রেষ্ঠ মানব প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স.) নিজে এবং তাঁর সাহাবিগণ জীবিকার জন্য পরিশৃম করতে লজ্জাবোধ করতেন না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা শ্রমজীবীদের প্রশংসায় বলেন, “এমন বহুলোক আছে যারা জমিনের দিকে ভ্রমণ করে ও আল্লাহর অনুগ্রহ খুঁজে বেড়ায়।” (সূরা আল-মুয�্যামিল, আয়াত ২০)

ইসলামে শ্রমিকের মজুরি সাথে সাথে আদায় করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। এ সম্পর্কে মহানবি (স.) বলেন, ‘মজুরের শরীরের ঘাম শুকানোর আগেই তার মজুরি আদায় করে দেবে।’ (বায়হাকি)

সুতরাং আমরা সবাই শ্রমের প্রতি মর্যাদাশীল হবো, নিজেদের কাজ নিজেরাই করব এবং আমরা নিজেরা স্বাবলম্বী হবো।

দলীয় কাজ : কী কী কাজ শিক্ষার্থী নিজেরা করতে পারে তার একটি তালিকা তৈরি করে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ৭

ক্ষমা (الْعَفْوُ)

মহান আল্লাহর অন্যতম গুণ ক্ষমা। সুন্দর সমাজ গঠনের জন্য মানুষের এ গুণটি থাকা খুবই প্রয়োজন।

ক্ষমার আরবি প্রতিশব্দ ‘আফ্টন’ (عَفْوٌ)-এর অর্থ মাফ করা, প্রতিশোধ গ্রহণ না করা। ইসলামি পরিভাষায় এর অর্থ হলো প্রতিশোধ গ্রহণের পূর্ণ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিশোধ না নিয়ে মাফ করে দেওয়া।

গুরুত্ব

মহান আল্লাহ সর্বশক্তিমান। তিনি মানুষকে অনেক নিয়ামত দান করেছেন। মানুষের সুখ-শান্তির ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু মানুষ তার অজ্ঞতার কারণে সেই সর্বশক্তিমান প্রভুর কথা ভুলে যায়, তাঁর হৃকুম অমান্য করে, তাঁর সাথে অংশীদার স্থাপন করে। পরে যখন মানুষ নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুত্ত হয় এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, তখন আল্লাহ মানুষকে ক্ষমা করে দেন। মহান আল্লাহর ঘোষণা “তিনিই তাঁর বান্দাদের তওবা করুন এবং পাপসমূহ ক্ষমা করেন।” (সূরা আশ-শুরা, আয়াত ২৫)

আল্লাহ সর্বশক্তিমান ও মহাপরাক্রমশালী হওয়া সত্ত্বেও মানুষকে ক্ষমা করে দেন। মহান আল্লাহ তাঁর রাসূল (স.)-কে ক্ষমার নীতি অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেছেন,

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمِرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجِهِلِينَ

অর্থ : “আপনি ক্ষমা করুন, সৎকাজের নির্দেশ দিন এবং অজ্ঞদেরকে এড়িয়ে চলুন।” (সূরা আল-আরাফ, আয়াত ১৯৯)

মহান আল্লাহ আরও বলেন,

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ

অর্থ : “অতএব, আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।” (সূরা আলে-ইমরান, আয়াত ১৫৯)

যেসব মানুষ আল্লাহ এবং তাঁর দেওয়া বিধান অমান্য করে, পরবর্তীতে অনুত্স্ত হয়ে আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হয় সর্বশক্তিমান আল্লাহ সেসব বান্দাকে ক্ষমা করে দেন।

ক্ষমার ব্যাপারে মহান রাবুল আলামিনের নীতি ও আদর্শ আমাদের অনুসরণ করা আবশ্যিক। মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয়, কোনো কাজে বা কথায় তার ভুলগুটি হয়ে যেতে পারে। অতএব, অন্যের ভুলভাস্তি, ভুটি-বিচ্যুতিসমূহ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে আমাদের দেখা উচিত।

মানুষকে ক্ষমা করলে আল্লাহ খুশি হন এবং যে ক্ষমা করে আল্লাহ তার গুনাসমূহ ক্ষমা করে দেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفُحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

অর্থ : “আর যদি তুমি তাঁদের মার্জনা কর, তাঁদের দোষ-ক্রটি উপেক্ষা কর এবং ক্ষমা কর, তবে জেনে রেখো আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।” (সূরা আত-তাগাবুন, আয়াত ১৪)

মহানবি (স.) ছিলেন ক্ষমার মূর্ত প্রতীক। একবার এক ইহুদি মহিলা প্রিয় নবি (স.)-কে তার বাড়িতে দাওয়াত দেন এবং বিষ মিশ্রিত ছাগলের গোশত তাঁকে খেতে দেন। রাসুল (স.) উক্ত গোশতের কিছু খেতেই বিষক্রিয়া অনুভব করেন। পরে ঐ মহিলা গোশতে বিষ দেওয়ার কথা স্বীকার করে। কিন্তু প্রিয় নবি (স.) তাকে ক্ষমা করে দেন। এমনিভাবে মক্কা বিজয়ের পর মহানবি (স.) প্রাণের শত্রুদেরকেও ক্ষমা করে দেন। তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, ‘আজ তোমাদের বিবৃক্ষে আমার কোনো অভিযোগ নেই। তোমরা মুক্ত স্বাধীন।’ পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ ক্ষমার উদাহরণ আর দ্বিতীয়টি নেই। অপরাধীকে ক্ষমা করলে অপরাধী লজ্জিত হয়ে অপরাধ ছেড়ে দেয়। শত্রুকে ক্ষমা করলে শত্রু বন্ধুত্বে পরিণত হয়। আমরা অন্যকে ক্ষমা করব। অন্যকে ভালোবাসব।

দলীয় কাজ : শিক্ষার্থীরা ক্ষমার ছোট ছোট ঘটনা যা নিজের জীবনে ঘটেছে, তা নিজের ভাষায় লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

বাড়ির কাজ : ক্ষমার শুরুত্ব বর্ণনা কর।

পাঠ ৮

অসদাচরণ (الْأَخْلَاقُ الْمُنْيَةُ)

এমন কিছু আচরণ বা কাজ যা মানুষকে হীন, নিচু ও নিন্দনীয় করে তোলে, সেগুলোকে আখলাকে যামিমাহ বা নিন্দনীয় আচরণ বলে। নিন্দনীয় আচরণগুলো হচ্ছে হিংসা, ক্রোধ, লোভ, প্রতারণা, পিতামাতার অবাধ্য হওয়া, ইভটিজিং, ছিনতাই প্রভৃতি। এ নিন্দনীয় আচরণগুলো মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনকে কল্পিত করে। এ চরিত্রের অধিকারীকে মানুষ ঘৃণা করে। ইহকাল ও পরকালে সে ঘৃণিত ও অভিশপ্ত হবে। জাহানামের নিম্নস্তরে পৌছে যাবে। (তাবারানি)

আখলাকে যামিমাহ্র কুফল

১. ঘৃণার পাত্র

হীন বা মন্দ চরিত্রের লোকেরা সমাজের কাছে যেমনিভাবে ঘৃণার পাত্রে পরিগত হয়, তেমনিভাবে পরিবারের কাছেও ঘৃণিত হয়। পরকালেও সে ঘৃণিত ও অভিশপ্ত হবে। এ প্রসঙ্গে মহানবি (স.) বলেন, ‘বান্দা তার কুচরিত্বের কারণে জাহানামের নিম্নস্তরে পৌছে যাবে।’ (তাবারানি)

২. জান্মাত থেকে বধিত

মন্দ চরিত্রের লোকেরা পরকালে জান্মাত লাভ করতে পারবে না। এ প্রসঙ্গে মহানবি (স.) বলেন,

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَجْوَاطُ وَلَا الْجَعَظَرِي -

অর্থ : ‘দুশ্চরিত্ব ও রাঢ় স্মভাবের মানুষ জান্মাতে প্রবেশ করতে পারবে না।’ (আবু দাউদ)

চরিত্র সংশোধন ব্যতীত আত্মার সংশোধন সম্ভব হয় না। এজন্য চারিত্রিক দুর্বলতার সব দিকগুলোর সংশোধন করা আবশ্যিক।

দলীয় কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে অসদাচরণের কুফলগুলোর একটি তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ ৯

হিংসা (হাস্তস্ত)

অন্যের সুখ-সম্পদ, মানসম্মান নষ্ট হওয়ার কামনা এবং নিজে এর মালিক হওয়ার বাসনা করাকে হিংসা বলে। হিংসা শব্দের আরবি প্রতিশব্দ ‘হাসাদুন’ (হাস্তস্ত), যার অর্থ হিংসা, ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি।

অপকারিতা

হিংসা একটি মারাত্মক মানসিক ব্যাধি। হিংসা বহু কারণে সৃষ্টি হয়। যেমন : শত্রুতা, লোভ, অহংকার, নিজের অসৎ উদ্দেশ্য নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা, নেতৃত্বের লোভ ইত্যাদি। এসব কারণে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির প্রতি হিংসা-বিদ্যে করে থাকে। ইসলাম এ কাজগুলোকে হারাম ঘোষণা করেছে। হিংসার অপকারিতা সীমাহীন। হ্যরত আদম (আ.)-এর মর্যাদা দেখে ইবলিস তাঁর প্রতি হিংসা করে। ফলে সে অভিশপ্ত হয়। আল্লাহ তায়ালার দয়া থেকে বধিত হয়।

মানব সৃষ্টির পর হিংসার কারণেই সর্বপ্রথম পাপ সংঘটিত হয়। আদম (আ.)-এর পুত্র কাবিল হিংসার বশবর্তী হয়ে তারই আপন ভাই হাবিলকে হত্যা করে। হিংসা মানুষের ভালো কাজগুলোকে ধ্বংস করে দেয়। এ সম্পর্কে মহানবি (স.) বলেছেন,

إِنَّ الْحَسَدَ يَا كُلُّ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ -

অর্থ : ‘আগুন যেমন শুকনা কাঠকে জ্বালিয়ে ছাই করে দেয়, হিংসা তেমনই পুণ্যকে ধূংস করে দেয়।’ (ইবনে মাজাহ)

হিংসা মানুষের শান্তি বিনষ্ট করে। মনে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে রাখে। হিংসুক ব্যক্তি আল্লাহ এবং মানুষের কাছে ঘৃণিত। কেউ তাকে ভালোবাসে না। কেউ তাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে না। সমাজের লোকেরা তাকে এড়িয়ে চলে। হিংসা সমাজে বাগড়া-ফাসাদ, মারামারি এবং অশান্তি সৃষ্টি করে। মানুষের মনে অহংকার সৃষ্টি হয়। অহংকার মানুষের পতন ঘটায়।

আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজিদে হিংসা থেকে বেঁচে থাকার শিক্ষা দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

অর্থ : “আর হিংসুকের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই যখন সে হিংসা করে।” (সূরা আল-ফালাক, আয়াত ৫)

আল্লাহ তায়ালা হিংসা বর্জনকরীকে ভালোবাসেন। হিংসা বর্জনকরী জান্নাত লাভ করবেন। প্রিয় নবি একবার তাঁর এক সাহাবিকে জান্নাতি বলে ঘোষণা দেন। তিনি কী আমল করেন এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালা যাকে কোনো উভয় বন্ধু দান করেছেন আমি তার প্রতি কথনোই হিংসা পোষণ করি না। (ইবনে মাজাহ)

আমাদের প্রতিজ্ঞা হওয়া উচিত ‘আমরা হিংসা করব না। নিজের ক্ষতি করব না। সমাজের শান্তি বিনষ্ট করব না।’

দলীয় কাজ : শিক্ষার্থীরা হিংসার কুফলের একটি তালিকা তৈরি করে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ১০

ক্রোধ (الْغَضَبُ)

‘ক্রোধ’ এর আরবি প্রতিশব্দ ‘গাদাব’(غَضَب), যার অর্থ রাগ। স্বীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়া বা কারো দ্বারা তিরস্কৃত হওয়ার কারণে প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছায় মানুষের মনের মধ্যে যে ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়, তাকে ক্রোধ বলে। অহংকার, তিরস্কার, বাগড়া প্রভৃতি কারণে ক্রোধের সৃষ্টি হয়।

ক্রোধ ও রাগের ফলে মানুষ অনেক নির্দয় ও অত্যাচারমূলক কর্মকাণ্ড করে ফেলে। পরবর্তিতে এর কারণে লজ্জিত ও অবজ্ঞার পাত্রে পরিণত হয়। তাই মুসলমানদের উচিত ক্রোধের সময় নিজেকে সংবরণ করা। এ বিষয়ে মহানবি (স.) বলেন,

لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرُعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ -

অর্থ : ‘শক্তিশালী সেই ব্যক্তি নয়, যে খুব কুস্তি লড়তে পারে। বরং প্রকৃত শক্তিশালী হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে ক্রোধের সময় নিজেকে সংযত রাখতে পারে।’ (বুখারি ও মুসলিম)

অপকারিতা

ক্রোধ একটি নিন্দনীয় বিষয়। এটি মানুষের মধ্যে বাগড়া-বিবাদ ও হিংসা-বিদেশ সৃষ্টি করে। আর হিংসা মানুষের সংকর্মসমূহ শেষ করে দেয়। ক্রোধের সময় মানুষের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। সে নিজেকে সংযত রাখতে পারে না। ক্রোধ মানুষের ইমানকে ধ্বংস করে দেয়। এ সম্পর্কে মহানবি (স.) বলেন, ‘সিরকা মধুকে যেভাবে বিনাশ করে, ক্রোধও ইমানকে তদ্দুপ নষ্ট করে।’ (বায়হাকি)

ক্রোধ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আল্লাহর গ্যব থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। প্রিয় নবির সাহাবি হ্যরত ইবনে উমার (রা.) রাসুলুল্লাহ (স.)-এর কাছে জানতে চাইলেন, এমন কোনো কাজ আছে যা আল্লাহ তায়ালার গ্যব থেকে রক্ষা করবে? রাসুল (স.) বলেন, ‘তুমি রাগ করবে না।’ (তাবারানি)

ক্রোধ সংবরণ করা একটি পুণ্যের কাজ। রাসুল (স.)-এর এক সাহাবি একবার রাসুল (স.)-কে বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসুল, আপনি আমাকে একটি ভালো কাজের নির্দেশ দিন।’ প্রিয় নবি (স.) তাকে বললেন ‘তুমি রাগ করবে না।’ (বুখারি)

মহানবি (স.) বলেছেন, ‘ক্রোধ শয়তানের পক্ষ থেকে আসে, শয়তান আগুনের তৈরি। আর আগুনকে পানি ঠাণ্ডা করে। যদি কারো রাগ হয়, তবে তার উচিত ওয়ু করে নেওয়া।’ (বুখারি ও মুসলিম)

দলীয় কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ক্রোধ পরিহারের উপায়গুলো বের করবে এবং পোস্টারে লিখে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবে।

বাড়ির কাজ : ‘ক্রোধ একটি নিন্দনীয় বিষয়’—ব্যাখ্যা কর।

পাঠ ১১

লোভ (أَكْرَصُ)

লোভ-এর আরবি প্রতিশব্দ ‘হিরহুন’ (حِرْصٌ), এর অর্থ লালসা, লিঙ্গা, মোহ, আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা ইত্যাদি। অধিক পাওয়ার ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষাকে লোভ বলে। যেমন: অর্থ-সম্পদের লোভ, পদমর্যাদার লোভ, খাদ্যদ্রব্যের লোভ, পোশাক-পরিচ্ছদের লোভ ইত্যাদি।

লোভের কুফল

লোভ মানুষের মনের শান্তি বিনষ্ট করে। অধিক পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা মানুষকে সারাক্ষণ বিভোর রাখে। ফলে নিজের কাছে যা আছে তাতে তুষ্ট না থেকে আরও পাওয়ার আশায় সে অস্থির থাকে।

লোভ মানুষকে নানা প্রকার অপরাধমূলক কাজের দিকে ধাবিত করে। চুরি, ডাকাতি, রাহজানি, কালোবাজারি, মজুদদারি, দ্রব্যে ভেজাল দেওয়া, সুদ-স্থুর খাওয়া ইত্যাদি অপরাধমূলক কাজ লোভের কারণেই সংঘটিত হয়।

লোভী ব্যক্তি অন্যের ধন-সম্পদের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিষ্কেপ করে এবং অবৈধ উপায়ে তা হস্তগত করার চেষ্টা করে। ইসলাম এরূপ লোভকে নিষিদ্ধ করেছে। প্রিয় নবি (স.) বলেছেন, ‘তোমরা লোভ-লালসা থেকে বেঁচে থাক। কেননা এই জিনিসই তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করেছে এবং পরস্পরকে রক্তপাত ঘটানোর ব্যাপারে উস্কে দিয়েছে। আর এই লোভ-লালসার কারণেই তারা হারামকে হালাল সাব্যস্ত করেছে।’ (সহিত মুসলিম)

খাদ্যের প্রতি লোভে অনেকে মাত্রাতিরিক্ত থায়। এতে সে নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। আবার কখনো তা তার জীবন নাশেরও কারণ হয়। আর তাই কথায় বলে, ‘লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।’

লোভ থেকে বাঁচার উপায়

ধৈর্য এবং অঙ্গে তুষ্টির গুণ থাকলে লোভ-লালসা থেকে মুক্ত থাকা যায়। রাসুল (স.) বলেছেন, ‘ইমান এবং লোভ এক অন্তরে একত্রিত হতে পারে না, কেননা ইমানের পরিনাম হচ্ছে ধৈর্য, তাওয়াকুল এবং অঙ্গে তুষ্টি থাকা।’ (নাসাই ও তিরমিয়ি)

তকদিরের উপর বিশ্বাস রাখা লোভ দমনের প্রধান উপায়। মহানবি (স.) বলেন, ‘হে মানবমঙ্গলী! তোমরা চাওয়ার ক্ষেত্রে উত্তম পদ্ধা অবলম্বন কর। কেননা বান্দার ভাগ্যে যা নির্ধারিত আছে তার অতিরিক্ত সে পাবে না।’ (হাকিম)

জীবনযাপনের ক্ষেত্রে সহজ-সরল পথ অবলম্বন করলে লোভ বর্জন করা সম্ভব হয়। আমরা লোভের কুফল জানব। লোভ বর্জন করব। তকদিরে বিশ্বাস করব। অঙ্গে তুষ্টি থাকব। নিজেরা সুখে থাকব। সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করব।

দলীয় কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে লোভের কুফল আলোচনা করে লোভ বর্জনের উপায়গুলোর একটি তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ ১২

প্রতারণা (الْغَشْ)

প্রতারণার আরবি প্রতিশব্দ ‘আল-গাস্শু’ (الْغَشْ) যার অর্থ ঠকানো, ফাঁকি দেওয়া, প্রবন্ধনা ও ধোঁকা। কথাবার্তা, আচার-আচরণ, লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে ধোঁকা দেওয়াকে প্রতারণা বলে। পণ্ডিতব্যের দোষ-ত্রুটি গোপন রেখে বিক্রি করা, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা ইত্যাদি প্রতারণার অন্তর্ভুক্ত।

কুফল

ইসলামের দৃষ্টিতে প্রতারণা একটি মানবতাবিরোধী অতি গর্হিত কাজ। এটি মিথ্যার শামিল। ইসলাম সত্যের সাথে মিথ্যার মিশ্রণকে সমর্থন করে না। কুরআন মজিদে ঘোষণা করা হয়েছে,

وَلَا تَلِبِّسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

অর্থ : “তোমরা সত্যের সাথে মিথ্যার মিশ্রণ করো না এবং তোমরা জেনে- শুনে সত্যকে গোপন করো না।”
(সূরা আল-বাকারা, আয়াত ৪২)

প্রতারণা একটি সামাজিক অপরাধ। কারণ এর ফলে মানুষ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে। সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা বিস্তৃত হয়। সমাজের মানুষের জীবনযাত্রা দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। প্রতারণাকারী খাঁটি মুসলমান নয়। আমাদের নবি (স.) একদিন বাজারে গিয়ে খাদ্যদ্রব্যের একটি বড় স্তুপ দেখতে পান। স্তুপটির উপরিভাগের দ্রব্য শুকনো ছিল। কিন্তু স্তুপটির ভিতরের অংশও শুকনো আছে কি না তা পরীক্ষা করার জন্য তিনি ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিলেন। তখন তিনি ভিতরের অংশ ভিজা দেখতে পেলেন। রাসুলুল্লাহ (স.) মালিকের কাছে এর কারণ জানতে চাইলেন। মালিক জানাল তাতে বৃষ্টির পানি লেগেছে। তখন রাসুল (স.) তাকে বললেন, তুমি ভেজা খাদ্য উপরে রাখলে না কেন? যাতে লোকেরা তা দেখতে পেত?

এ প্রসঙ্গে মহানবি বললেন,

مَنْ غَشَ فَلَيْسَ مِنِّي

অর্থ : ‘যে ব্যক্তি প্রতারণা করে সে আমার উদ্ধৃত নয়।’ (মুসলিম)

প্রতারণা মুনাফিকের কাজ। এর শাস্তি বড় কঠিন। সত্যিকার ইমানদার ব্যক্তি কখনোই প্রতারণার আশ্রয় নেয় না। মানুষকে ধোঁকা দেয় না। অজীকার ভঙ্গ করে না।

আমরা প্রতারণা করব না। মানুষকে ধোঁকা দেবো না। অজীকার ভঙ্গ করব না।

দলীয় কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে প্রতারণার কুফল আলোচনা করবে এবং

এগুলোর একটি তালিকা তৈরি করবে।

বাড়ির কাজ : তুমি বা তোমার পরিবারের কেউ প্রতারিত হয়ে থাকলে সে ঘটনা সংক্ষেপে লেখ।

পাঠ ১৩

পিতামাতার অবাধ্য হওয়া (الْوَالِدِينِ) (عُقُوقُ)

পিতামাতার অবাধ্য হওয়া বলতে বোঝায়, তাঁদের শৃঙ্খলা ও সম্মান না করা। পিতামাতার কথামতো না চলা, তাঁদের নির্দেশ অমান্য করা। আল্লাহর অনুগ্রহের পর সন্তানদের প্রতি পিতামাতার অনুগ্রহ সবচেয়ে বেশি। তাঁরা সন্তানের আপনজন। তাঁদের স্নেহ-মমতায় সন্তান লালিত-পালিত হয়। সন্তানের আরাম আয়েশের জন্য ফর্মা নং-১৩(ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা, ৭ম শ্রেণি)

তাঁরা সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেন। সন্তানের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য তাঁরা সবরকম ব্যবস্থা করেন। কাজেই সন্তানের কর্তব্য হলো পিতামাতার বাধ্য থাকা।

পিতামাতার অবাধ্য হওয়া জগন্য অপরাধ। এর অপকারিতা অনেক।

অপকারিতা

১. শিরকের পর সবচেয়ে বড় গুনাহ পিতামাতার অবাধ্য হওয়া।

২. পিতামাতার অবাধ্য হওয়ার পাপ এত ভয়াবহ যে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা এ পাপ ক্ষমা করেন না। এ বিষয়ে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, ‘মহান আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী সকল পাপই ক্ষমা করে দেন। কিন্তু পিতামাতার অবাধ্যতার পাপ তিনি ক্ষমা করেন না।’ (বায়হাকি)

৩. পিতামাতার অবাধ্য হলে পরকালে জাহানামের কঠিন আগুনে ডুলতে হবে।

এ বিষয়ে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, ‘তাঁরাই (পিতামাতা) তোমার বেহেশত ও দোষখ।’ (ইবনে মাজাহ)

অর্থাৎ পিতামাতার সন্তুষ্টির উপর যেমন সন্তানের জান্নাত লাভ নির্ভর করে, ঠিক তেমনি তাঁদের অসন্তুষ্টির কারণে সন্তান দোষখবাসী হবে। নবি করিম (স.) আরও বলেন, ‘তার নাক ধূলিমলীন হোক, আবার তার নাক ধূলিমলীন হোক, আবার তার নাক ধূলিমলীন হোক।’ তাঁকে জিজ্ঞাস করা হলো, হে আল্লাহর রাসুল! সে কে? তখন তিনি বললেন, ‘যে ব্যক্তি পিতামাতার যেকোনো একজনকে অথবা উভয়কে বৃদ্ধ অবস্থায় পেল, তবুও সে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারল না।’ (মুসলিম)

৪. মাতার অবাধ্য হওয়াকে আল্লাহ তায়ালা হারাম ঘোষণা করেছেন।

রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, ‘আল্লাহ তোমাদের জন্য মায়েদের অবাধ্য হওয়াকে হারাম করে দিয়েছেন।’
(সহিহ বুখারি)

৫. পিতা সন্তানের প্রতি অসন্তুষ্ট হলে আল্লাহ তায়ালাও তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন।

রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, ‘পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি।’
(তিরমিয়ি)

পিতামাতা সন্তানের কল্যাণেই কখনো তাঁদের শাসন করেন বা কড়া কথা বলেন। এটা সন্তানকে মেনে নিতে হবে। এতে তার ভবিষ্যৎ সুখময় হবে।

আমরা পিতামাতার আদেশ-নিষেধ মেনে চলব। এটি মানবিক দায়িত্ব। এতে তাঁরা সন্তুষ্ট থাকবেন। আল্লাহ আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন।

দলীয় কাজ : শিক্ষার্থীরা ৪/৫টি দলে ভাগে হয়ে পিতামাতার অবাধ্যতার পরিণতি কী তার একটি তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ ১৪

ইভটিজিং (إِبْتِيجَنْسَاءُ)

ইভটিজিং শব্দটি ইভ (Eve) ও টিজিং (Teasing)- এর একত্রিতরূপ। বাইবেল অনুসারে প্রথম নারীর নাম ইভ (Eve)। এখানে ‘ইভ’ বলতে নারী সমাজকে বোঝানো হয়েছে। আর ‘Tease’ অর্থ পরিহাস, জ্বালাতন করা, উত্ত্যক্ত করা, খেপানো। ইভটিজিং বলতে কথা, কাজ, আচরণ ইত্যাদির মাধ্যমে নারীদের উত্ত্যক্ত করাকে বোঝানো হয়েছে। নারীদের প্রতি অশালীন উক্তি করা, অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করা ইভটিজিংয়ের অন্তর্ভুক্ত।

১৯৭৬ সালে প্রগৌত ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ অডিন্যাস -এ ইভটিজিং -কে সংজ্ঞায়িত করা হয়। যাতে বলা হয় যে, রাস্তা বা জনসমূহে কোনো নারীকে অশোভন শব্দ, অঙ্গভঙ্গি ও মন্তব্যের মাধ্যমে যৌন উৎপীড়ন করা ইভটিজিং হিসেবে গণ্য হবে।

অপকারিতা

ইভটিজিং একটি সামাজিক ব্যাধি। নারীদেরকে উত্ত্যক্ত করা, কাউকে মন্দনামে ডাকা বা উপহাস করা গর্হিত কাজ। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

**وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابُّوْا بِالْأَلْقَابِ طِبْسُ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ح
وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ**

অর্থ : “তোমরা একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করবে না এবং একে অপরকে মন্দনামে ডাকবে না। ইমান গ্রহণের পর মন্দনামে ডাকা বড় ধরনের অপরাধ। যারা তওবা না করে তারাই যালিম।” (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত ১১)

বর্তমানে প্রায়ই স্কুল-কলেজের সামনে, রাস্তার মোড়ে, গলির মুখে কিছু বখাটে ছেলে দাঁড়িয়ে মেয়েদেরকে উত্ত্যক্ত করে। এর ফলে অনেক মেয়ে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে, প্রয়োজনীয় শিক্ষা থেকে বাষ্পিত হয়। কেউ কেউ আবার আত্মহত্যার পথও বেছে নেয়। এতে সামাজিক শান্তি বিনষ্ট হয়। সমাজে অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়। আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে। জাতি ধর্মের দিকে ধাবিত হয়।

প্রতিকার

১৯৭৬ সালে প্রগৌত বাংলাদেশ আইনে ইভটিজিং একটি শান্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়েছে। এর শান্তি হিসাবে সর্বোচ্চ ১ বছর কারাদণ্ড অথবা দুই হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করার বিধান রাখা হয়েছে। পারিবারিক অনুশাসন, ধর্মীয় শৃঙ্খলা, সামাজিক সচেতনতা এবং আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে এটি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

আমরা ইভটিজিংয়ের মতো খারাপ কাজ করব না। আমরা সবসময় ভদ্র, ন্য, শালীন আচরণ করব। ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী জীবনযাপন করব।

দলীয় কাজ : শিক্ষার্থীরা ইভটিজিংয়ের ফলে কী কী সামাজিক ক্ষতি হয় তার একটি তালিকা তৈরি কর।

বাড়ির কাজ : সমাজে ইভটিজিং প্রতিরোধ করতে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যায় তার একটি তালিকা তৈরি কর।

পাঠ ১৫

ছিনতাই (الْأَنْتَابُ)

জোরপূর্বক বা বল প্রয়োগ করে অন্যের সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়াকে ছিনতাই বলে। ছিনতাই একটি সমাজবিরোধী কর্মকাণ্ড। এতে সমাজের শান্তি বিনষ্ট হয়। মানুষ স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে না। নিরপত্তাহীনতায় থাকে।

কুফল

ছিনতাই একটি জঘন্য সামাজিক অনাচার। এটি চুরি-ডাকাতি অপেক্ষা মারাত্ক ছিনতাই সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট করে। সামাজিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে। এর ফলে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়। মানুষের মূল্যবান অর্থ সম্পদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। ফলে সমাজে ও রাষ্ট্রে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়।

ছিনতাইকারী দুনিয়াতে ও আধিকারে নির্মম শাস্তি ভোগ করবে। এ সম্পর্কে মহানবি (স.) বলেন,

مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِّنَ الْأَرْضِ فُلِمَا فَيَانَةٌ يُطْوَقَهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ -

অর্থ : ‘যে ব্যক্তি সামান্য পরিমাণ জমি ছিনতাই করে, কিয়ামতের দিন সাতগুণ জমি তার গলায় বেড়িরূপে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে।’ (বুখারি ও মুসলিম)

যে ছিনতাই করে তার পূর্ণ ইমান থাকে না। এ সম্পর্কে মহানবি (স.) বলেন, ‘কোনো ব্যক্তি প্রকাশ্যে ছিনতাই ও লুটতরাজ করলে সে মুমিন থাকে না’

ছিনতাই বর্বর যুগের চরিত্রবিশেষ। ইসলাম এ বর্বরতাকে সমূলে উৎপাটন করার লক্ষ্যে ঘোষণা করেছে,

لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَارٍ فِي الْإِسْلَامِ

অর্থ : ‘ইসলামি বিধানে না নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার নিয়ম আছে, না অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করার নিয়ম আছে।’

পবিত্র কুরআন মজিদে এবং মহানবি (স.)-এর হাদিসে ছিনতাই, ডাকাতি, লুটতরাজ ইত্যাদি অপকর্মের জন্য দ্রষ্টান্তমূলক শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন।

প্রতিকার

এ ধরনের সামাজিক অপরাধ, অনাচার, অত্যাচার থেকে আমাদের মুক্তি পাওয়া একান্ত প্রয়োজন। সেজন্য সামাজিক সচেতনতা প্রয়োজন।

মানুষকে ছিনতাই-এর কুফল সম্পর্কে সচেতন করা এবং কুরআন ও হাদিসের আলোকে এর অপকারিতা সম্পর্কে অবহিত করা প্রয়োজন।

অপরাধীদেরকে এরূপ সামাজিক অনাচার থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করতে হবে। প্রয়োজনে আইনের হাতে সোপান করতে হবে।

সুষ্ঠু বিচারব্যবস্থা ও সচেতনতা বৃদ্ধি পেলে এ ধরনের অনাচার সমাজ থেকে দূর হবে।

আমরা ছিনতাইয়ের কুফল অনুধাবন করব। এ ধরনের জগন্য কাজে লিপ্ত হবো না। এ জগন্য কাজ যারা করে তাদেরকে এ থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করব।

দলীয় কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে নিজেদের মধ্যে ছিনতাইয়ের কুফল আলোচনা করে এর প্রতিকারের উপায়গুলো পোস্টার লিখে প্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. প্রশংসনীয় মাধ্যমেই উত্তম চরিত্র গড়ে ওঠে।
২. পরোপকারের মাধ্যমে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়।
৩. শালীনতা মানুষের অপরিহার্য বিষয়।
৪. মানুষের উপর প্রধানত ধরনের কর্তব্য রয়েছে।
৫. সমাজের প্রতিটি মানুষের নিজ নিজ দায়িত্ব তার নিকট পরিত্র।

বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর

বাম পাশ	ডান পাশ
১. আখলাকে যামিমাহ হচ্ছে	গচ্ছিত রাখা।
২. আমানত অর্থ	সামাজিক অপরাধ।
৩. সকল সৃষ্টিই আল্লাহ তায়ালার	নিকৃষ্ট চরিত্র।
৪. প্রতারণা একটি	পরিজন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. পরোপকারের পাঁচটি সুফল লেখ।
২. আমানত রক্ষার গুরুত্ব বর্ণনা কর।
৩. ক্রাদের ক্ষতিকর অবস্থা ব্যাখ্যা কর।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. 'তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি আমার নিকট প্রিয়, যার চরিত্র সর্বোত্তম' – হাদিসটির ব্যাখ্যা লেখ।
২. 'অশালীন পোশাক ও আচরণ' বিপর্যয় ডেকে আনে, উদাহরণসহ লেখ।
৩. ক্ষমার গুরুত্ব বর্ণনা কর।
৪. 'লোভের কারণেই যত বিপর্যয়' – উক্তিটির ব্যাখ্যা করে লোভ থেকে মুক্তির পাঁচটি উপায় বর্ণনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন যুদ্ধে বিজয়ের পর ইহুদি মহিলা মহানবি (স.)-কে বিষ মিশ্রিত গোশত থেতে দেয়?

- | | |
|-----------|-----------|
| ক. বদর | খ. উত্তুদ |
| গ. খাইবার | ঘ. হুনাইন |

২. 'নামায শেষে তোমরা জমিনের বুকে ছড়িয়ে পড়।' আল্লাহ তায়ালার এ নির্দেশের উদ্দেশ্য কী?

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| ক. শ্রমের ফজিলত বর্ণনা করা | খ. নামাযের গুরুত্ব বর্ণনা করা |
| গ. শ্রমের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা | ঘ. শ্রমের গুরুত্ব বর্ণনা করা |

৩. শালীনতার গুরুত্ব অপরিসীম, কারণ তা মানুষকে –

- i. আল্লাহর অনুগত বান্দা হতে সাহায্য করে
- ii. পরিবেশের প্রতি সদাচরণে সহায়তা করে
- iii. অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. i | খ. i ও ii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

জাবির আবিরের নিকট একটি বই জমা রাখল। দুই দিন পর ফেরত চাইলে আবির বইটি ফেরত দিতে ব্যর্থ হয়।

৪. আবিরের দ্বারা কী লঙ্ঘিত হয়েছে?

- | | |
|--------|-----------|
| ক. আহদ | খ. আমানত |
| গ. আদল | ঘ. তাহসিব |

৫. আবিরকে বলা যায় -

ক.	মুশরিক	খ.	মুনাফিক
গ.	ফাসিক	ঘ.	কাফির

সূজনশীল প্রশ্ন

১। শিল্পতি জামিল সাহেব তাঁর গার্মেন্টসে কর্মচারীদের যথাসময়ে উপযুক্ত পারিশুমিক পরিশোধ করেন। তিনি সততার সাথে কাজ করতে এই বলে সতর্ক করে দেন, যেন তার কারখানায় তৈরি পোশাকে কোনোরকম সমস্যা না থাকে। কাপড় কম দেওয়া বা সেলাইয়ে সুতা যেন খারাপ না হয়। তারপরেও এক কর্মচারী ইচ্ছাকৃতভাবে কাপড় কম দিয়ে পোশাক তৈরি করে। ঐ কর্মচারী কাপড় কম দেওয়ার বিষয়টি গোপন রাখে। এতে জামিল সাহেবের ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে জামিল সাহেব ঐ কর্মচারীর বেতন বম্ব করে দেন। একপর্যায়ে সামান্য বেতনের ঐ কর্মচারীর পারিবারের সমস্যার কথা বুঝালে জামিল সাহেব কর্মচারীকে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে বলেন।

ক. ক্ষমা এর আরবি প্রতিশব্দ কী?

খ. শুমের মর্যাদা বলতে কী বোঝায়?

গ. জামিল সাহেবের সর্বশেষ আচরণে যে গুণটি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ‘সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর কর্মকাণ্ড একটি সামাজিক অপরাধ’—মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

২। জহির সাহেব একজন চরিত্রবান লোক। রজব মিয়া তাঁর বাড়িতে মাসিক দুই হাজার টাকা বেতনে কাজ করে টাকাগুলো জহির সাহেবের নিকটই জমা রাখেন। এভাবে দুই বছর কাজ করার পর ঢাকা শহরে বেড়াতে এসে নিখোঁজ হন। এ অবস্থায় জমানো টাকা দিয়ে জহির সাহেব তার এলাকায় এক বিঘা জমি ক্রয় করে রজব মিয়ার নামে কওলা করেন। দীর্ঘ দশ বছর পরে রজব মিয়া জহির সাহেবের বাড়িতে ফিরে আসলে, জহির সাহেব তাঁর জমির দলিল হাতে দিয়ে জমি বুঝিয়ে দেন। অপর দিকে আরমান সাহেবের ড্রাইভার রমিজ মিয়া বিদেশে যাওয়ার জন্য জমি বিক্রি করে আরমান সাহেবের নিকট দুই লাখ টাকা দেন। আরমান সাহেব তাকে বিদেশে পাঠানোর কথা বলে একটি জাল ভিসা তৈরি করে দেন। রমিজ মিয়া এর মাধ্যমে বিদেশে যেতে ব্যর্থ হয়ে টাকা ফেরত চাইলে আরমান সাহেব বলেন, তোমাকে ভিসা দেওয়া হয়েছে, কাজেই তুমি বিদেশে যেতে না পারার দায়ভার আমি বহন করব না।

ক. কী কারণে মনের শান্তি নষ্ট হয়?

খ. আখলাকে যামিমাহ বলতে কী বোঝায়?

গ. জহির সাহেবের কাজটির মাধ্যমে কোন বিষয়টি রক্ষা পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ড্রাইভার রমিজ মিয়ার সাথে আরমান সাহেবের আচরণ বিশ্লেষণ কর।

পঞ্চম অধ্যায়

আদর্শ জীবনচরিত

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। মহান আল্লাহর আদেশ-নিষেধ অনুসরণ করলেই মানুষ সেরা হতে পারে। যে জীবন অনুসরণ ও অনুকরণ করলে মানুষের জীবন সুন্দর ও সফল হয়, তাকে আদর্শ জীবন বলে। আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে যেসব নবি ও রাসূল প্রেরণ করেছেন, তাঁদের জীবনই আমাদের জন্য আদর্শ। এমনিভাবে যেসব মনীষী, নবি ও রাসূলগণের পথ অনুসরণ করেছেন তাঁরাও আদর্শ মানুষ। তাঁদের জীবনের ভালো দিকগুলো আমাদের আদর্শ।

এ অধ্যায় শেষে আমরা –

- আদর্শ জীবনচরিত অধ্যয়নের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- হয়রত ইসমাঈল (আ.), হয়রত ইউসুফ (আ.), হয়রত মুহাম্মদ (স.), হয়রত উসমান (রা.), হয়রত আলি (রা.), ও হয়রত ফাতিমা (রা.)-এর জীবনচরিত বর্ণনা করতে পারব।
- মনীষীগণের গুণাবলি যেমন- সমাজসেবা, সাম্য, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, আত্মবোধ, সহমর্মিতা, পরমতসহিষ্ণুতা, সৌহার্দ, মানবিকতা, আধ্যাত্মিকতা, ত্যাগ, ক্ষমা, অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি, ন্যায়বিচার, দানশীলতা, পরোপকারিতা, দেশপ্রেম, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদিতে তাঁদের অবদান ও শিক্ষা ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন করতে পারব।
- বাস্তব জীবনে মনীষীগণের গুণাবলি অনুসরণ করে আদর্শ জীবন গঠনের উপায় বলতে পারব।
- দলগত কাজে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষার উপায় এবং সামগ্রিকভাবে নেতৃত্ব প্রদানের গুণাবলি চিহ্নিত করতে পারব।

পাঠ ১

হ্যরত ইসমাঈল (আ.)

জন্ম ও বৎস পরিচয়

হ্যরত ইসমাঈল (আ.) ছিলেন আল্লাহর নবি। তিনি হ্যরত ইবরাহিম (আ.)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁর মাতার নাম হাজিরা (আ.)। তিনি খ্রিষ্টপূর্ব ১৯১০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের সময় হ্যরত ইবরাহিম (আ.)-এর বয়স ছিল ৮৬ বছর। তিনি কুরাইশ ও উভর আরবের ‘আদনান’ বংশের আদি পিতা।

নির্বাসন ও জমজম কৃপ সূর্য

হ্যরত ইসমাঈল (আ.)-এর জন্মের কিছুদিন পর তাঁর পিতা হ্যরত ইবরাহিম (আ.) আল্লাহর নির্দেশে তাঁকে ও তাঁর মাতাকে নির্জন ভূমিতে রেখে আসেন। তিনি তাঁদেরকে কিছু খেজুর ও এক মশক পানি দিয়ে আসেন এবং তাঁদের জন্য এ বলে দোয়া করেন—“হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার বৎসধরদের কতককে বসবাস করালাম অনুর্বর উপত্যকায় তোমার পবিত্র গৃহের নিকট। ‘হে আমার প্রতিপালক! এজন্য যে তারা যেন নামায প্রতিষ্ঠা করে। অতএব, তুমি কিছু লোকের অন্তর তাঁদের প্রতি অনুরাগী করে দাও এবং ফলাদি দ্বারা তাঁদের রিয়ফের ব্যবস্থা কর, যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।” (সূরা ইবরাহিম, আয়াত ৩৭)



অল্প কিছুদিন পর তাঁদের খাবার ফুরিয়ে যায়। শিশু ইসমাঈল পানির সিপাসায় কাতর হয়ে ওঠেন। তার চিৎকারে মা হাজিরা (আ.) অস্থির হয়ে পড়েন। তিনি পানির সম্মানে সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ে সাতবার ছোটাছুটি করেন। কিন্তু কোথাও পানি পেলেন না। অবশেষে ফিরে এসে দেখতে পান শিশু ইসমাঈলের পদাঘাতে আল্লাহর হুকুমে সে স্থানে পানির স্নোতখারা প্রবাহিত হচ্ছে আর এটাই হলো জমজম কৃপের উৎস। হ্যরত হাজিরা (আ.) ঐ কৃপ থেকে নিজে পানি পান করেন এবং তাঁর শিশু পুত্রকেও তা পান করান। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন। এ কৃপকে কেন্দ্র করে জুরুম গোত্র সেখানে বসবাস শুরু করে। এ গোত্রে হ্যরত ইসমাঈল (আ.) বিবাহ করেন। কুরাইশ গোত্র এ গোত্রের একটি শাখা।

কুরবানি

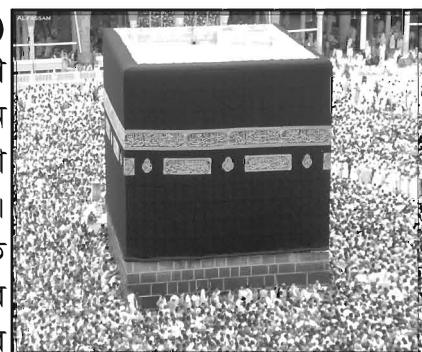
আল্লাহ তায়ালা হ্যরত ইবরাহিম (আ.)-কে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করেন। হ্যরত ইসমাঈল (আ.)-কে কুরবানি করার নির্দেশ ছিল একটি পরীক্ষা। একদা হ্যরত ইবরাহিম (আ.) সিরিয়া থেকে বিবি হাজিরা ও পুত্র ইসমাঈল (আ.)-কে দেখতে মকায় গমন করেন। তখন হ্যরত ইবরাহিম (আ.) স্বপ্নযোগে পুত্র ইসমাঈল (আ.)-কে কুরবানি করতে আদিষ্ট হন। তখন ইসমাঈলের বয়স ছিল ১৩ বছর। জাহ্বত হয়ে হ্যরত ইবরাহিম (আ.) পুত্র ইসমাঈল (আ.)-কে বলেন, ‘হে পুত্র! স্বপ্নে দেখলাম আমি তোমাকে কুরবানি করছি। তুমি কী বলো?’ তখন পুত্র ইসমাঈল কোনোরূপ বিচলিত না হয়ে আনন্দ চিন্তে উত্তরে বলেন, “হে পিতা! আপনি যা করতে আদিষ্ট হয়েছেন তা ই করুন। ইনশাআল্লাহ আমাকে আপনি ধৈর্যশীলদের অস্তর্ভুক্ত দেখতে পাবেন।”

(সূরা আস-সাফফাত, আয়াত ১০২)

হ্যরত ইবরাহিম (আ.) পুত্র ইসমাইল (আ.)-কে কুরবানি করার উদ্দেশ্যে ‘মিনা’র পথে রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে শয়তান ইসমাইল (আ.)-কে বারবার প্রতারিত করার চেষ্টা করে। কিন্তু তাতে তিনি বিন্দুমাত্র প্রভাবিত না হয়ে নির্বিঘ্নে মিনায় পৌছেন। হ্যরত ইবরাহিম (আ.) প্রাণ-প্রিয় পুত্রকে কুরবানি করার জন্য উদ্যোগ হলেন। এমন সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে হ্যরত ইবরাহিম (আ.) আওয়াজ শুনতে পেলেন, “হে ইবরাহিম! তুমি তোমার স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছ। এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করে থাকি।” (সূরা আস-সাফফাত, আয়াত ১০৫)। অলৌকিকভাবে পুত্র ইসমাইল (আ.)-এর স্থলে একটি দুষ্মা কুরবানি হয়ে গেল আর ইসমাইল (আ.) দুষ্মার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। এ ধারাবাহিকতায় আজকে আমাদের এ পশু কুরবানি কুরবানি করা ওয়াজিব।

কাবাঘুর নির্মাণ

হ্যরত ইসমাইল (আ.)-এর পিতা হ্যরত ইবরাহিম (আ.) আল্লাহর হুকুমে তাঁরই প্রদর্শিত স্থানে প্রথম কাবাঘর পুনঃনির্মাণ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন- “স্মরণ কর! যখন ইবরাহিম ও ইসমাইল কাবাঘরের প্রাচীর তুলে ছিল, তখন তারা বলেছিল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এ কাজ গ্রহণ কর। নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বজ্ঞাত।” (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১২৭)। হ্যরত ইবরাহিম (আ.) পাথরের গাঁথুনি লাগাতেন আর ইসমাইল (আ.) তাঁকে পাথর তুলে দিতেন। দীর্ঘ সময় ধরে পিতা-পুত্র কাবাঘর নির্মাণের কাজ সমাপ্ত করেন।



উপাধি লাভ

হ্যরত ইসমাইল (আ.) ছিলেন ধৈর্যশীল ও পিতাভক্ত। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে ‘ছাদেকুল ওয়াদ’ (অজীকার পালনকারী) উপাধিতে ভূষিত করেন। বর্ণিত আছে যে, তিনি জনৈক ব্যক্তির সাথে অজীকার করেছেন: অমুক স্থানে তার জন্য অপেক্ষা করবেন, লোকটি কথা অনুযায়ী সে স্থানে না আসলেও তিনি তার জন্য তিনি দিন পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকেন এবং তৃতীয় দিন তার সাথে সেখানে দেখা হয়। (ইবনে কাহির)

নিজের ওয়াদা রক্ষার জন্য তিনি দিন পর্যন্ত কষ্ট করে অপেক্ষা করেছিলেন বলে হ্যরত ইসমাইল (আ.)-কে আল্লাহ ছাদেকুল ওয়াদ বা অজীকার পালনকারী উপাধি দান করেছিলেন।

হ্যরত ইসমাইল (আ.)-এর বংশেই জন্মগ্রহণ করেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবি হ্যরত মুহাম্মদ (স.)। হ্যরত ইসমাইল (আ.) একশত ছত্রিশ বছর বয়সে মুক্তি নগরীতে ইন্তিকাল করেন। হ্যরত ইসমাইল (আ.) কর্তৃক আল্লাহর প্রতি আনুগত্য, পিতৃভক্তি, ত্যাগ, অজীকার পালন ইত্যাদি আমাদের জীবনের অনুসরণীয় দ্রষ্টান্ত।

দলীয় কাজ : শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে হ্যরত ইসমাইল (আ.)-এর কুরবানির কাহিনী ও জমজমের উৎপত্তির ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করবে।

পাঠ ২

হযরত ইউসুফ (আ.)

পরিচয়

হযরত ইউসুফ (আ.) ছিলেন আল্লাহর নবি। তাঁর পিতার নাম হযরত ইয়াকুব (আ.) আর মাতার নাম রাহিলা বিন্তে লাবন। তিনি হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর একাদশতম পুত্র। তিনি খ্রিষ্টপূর্ব ১৯২৭-১৮১৭-এর মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন কেনানের অধিবাসী। শারীরিক গঠনে অপূর্ব সৌন্দর্যের অধিকারী। আর ব্যবহারে বিনয়ী ও উন্নত চরিত্র গুণে গুণান্বিত। পরিত্র কুরআনে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাহিনীকে ‘আহসানুল কাসাস’ (সর্বোত্তম কাহিনী) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

ষড়যন্ত্রের কবলে হযরত ইউসুফ (আ.)

হযরত ইয়াকুব (আ.) সীয় পুত্র হযরত ইউসুফ (আ.)-কে অনেক আদর করতেন। এতে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সহৃদর বিন ইয়ামিন ব্যতীত অন্যান্য বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা তাঁর প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়। তারা তাঁর ব্যাপারে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। পিতা হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর অনুমতি নিয়ে একদিন তারা তাঁকে খেলার কথা বলে নির্জন একটি মাঠে নিয়ে যায়। সেখানে তারা তাঁকে মারধর করে একটি গভীর কূপে নিঙ্কেপ করে। বাড়িতে ফিরে এসে তাঁরা পিতাকে বলে, আমরা যখন খেলাধুলা করছিলাম তখন একটি বাঘ এসে তাঁকে ধরে নিয়ে যায় এবং খেয়ে ফেলে। দেখুন এই যে তাঁর রক্তমাখা জামাকাপড়। কিন্তু হযরত ইয়াকুব (আ.) তাঁদের কথায় বিশ্বাস করলেন না, বরং মর্মাহত হলেন। তিনি ক্রোধ প্রকাশ না করে ধৈর্যধারণ করে বললেন, “ধৈর্যই শ্রেষ্ঠ, তোমরা যা বলছ সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ আমার সাহায্যস্থল।” (সূরা ইউসুফ, আয়াত ১৮)

ক্ষীতদাস হিসেবে বিক্রয়

একটি বশিকদল ঐ কূপের পাশ দিয়ে মিসরে যাচ্ছিল। আল্লাহর ইচ্ছায় দলটি কূপের ধারে এসে থামল। তাঁরা পানির জন্য কূপের ভিতরে বালতি ফেললে হযরত ইউসুফ (আ.) বালতির রশি ধরে উপরে উঠে আসেন। তারা হযরত ইউসুফ (আ.)-কে দেখে বিস্মিত হয়ে বলল, “কী সুখবর! এ যে এক কিশোর! অতঙ্গের তারা তাকে পণ্যবূপে লুকিয়ে রাখল।” (সূরা ইউসুফ, আয়াত ১৯)

তারা হযরত ইউসুফ (আ.)-কে মিসরে দাস হিসেবে বিক্রি করে। মিসরের শাসক আজিজ তাঁকে স্বল্প মূল্যে মাত্র কয়েক দিনহামের (মুদ্রা) বিনিময়ে ক্রয় করেন। তিনি হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে পুত্রের মতো ভালোবাসতে থাকেন। হযরত ইউসুফ (আ.) যুবক বয়সে মিথ্যা অপবাদের দায়ে কারাবরণ করেন। তিনি আল্লাহ প্রদত্ত অসাধারণ মেধা ও বুদ্ধিমত্তার দরুণ ক্রমান্বয়ে কারাগারে সকলের শুন্দৰির পাত্র হয়ে ওঠেন। তিনি স্বপ্নের ভালো ব্যাখ্যা করতে পারতেন।

স্বপ্নের ব্যাখ্যা

একদিন মিসরের বাদশাহ স্বপ্ন দেখেন, ‘সাতটি সুস্থ-সবল গাভিকে সাতটি দুর্বল গাভি খেয়ে ফেলছে। তিনি আরও দেখেন সাতটি সবুজ শস্য শিষ এবং সাতটি শুষ্ক শিষ।’ তিনি এ স্বপ্নের ব্যাখ্যার জন্য রাজদরবারে জ্ঞানী-গুণী ও পঞ্জিতদের ডাকেন। কিন্তু কারোর ব্যাখ্যা তাঁর পছন্দ হয়নি। বাদশাহ খবর পেলেন কারাগারে এক যুবক আছেন, যিনি স্বপ্নের ভালো ব্যাখ্যা করতে পারেন। অবশ্যে বাদশাহ হযরত ইউসুফ (আ.)-এর নিকট এ স্বপ্নের

ব্যাখ্যা জানতে চান। স্বপ্নের ব্যাখ্যায় হ্যরত ইউসুফ (আ.) বলেন, ‘দেশে সাত বছর প্রচুর শস্য উৎপন্ন হবে। আর পরবর্তী সাত বছর একটানা ভীষণ দুর্ভিক্ষ চলবে।’ সাথে সাথে তিনি দুর্ভিক্ষ হতে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায়ও বলে দিলেন। এ ব্যাখ্যা বাদশাহের অত্যন্ত মনঃপূত হলো। ফলে তিনি হ্যরত ইউসুফ (আ.)-এর বিবুদ্ধে আনীত সকল অভিযোগ তুলে নেন এবং তাঁকে কারাগার থেকে মুক্তি দেন।

মন্ত্রী পদ লাভ

হ্যরত ইউসুফ (আ.)-এর দেখা স্বপ্নের ব্যাখ্যায় খুশি হয়ে বাদশাহ তাঁকে অর্থমন্ত্রীর পদে নিয়োগ দেন। স্বপ্নের ব্যাখ্যা অনুযায়ী প্রথম সাত বছর প্রচুর খাদ্যশস্য ফলন হয়। পরবর্তী সাত বছরে কম ফলন হওয়ায় মিসরে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। অভাবের তাড়নায় তাঁর ভ্রাতারা তিনবার খাদ্যশস্য সংগ্রহের জন্য রাজদরবারে আসে। প্রথমবারেই হ্যরত ইউসুফ (আ.) তাঁদের চিনে ফেলেন। কিন্তু তিনি তাঁদের নিকট নিজের পরিচয় প্রকাশ করেননি। তবে মানবিক কারণে প্রত্যেকবারই তাঁদেরকে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য বরাদ্দ দেন। দ্বিতীয়বার কৌশলে আপন সহোদর বিন ইয়ামিনকে আটকিয়ে রাখেন। তৃতীয়বার নিজের পরিচয় প্রদান করেন এবং পিতার-পরিবারের লোকজনকে রাজদরবারে আমন্ত্রণ জানান। তখন ভ্রাতাগণ নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে হ্যরত ইউসুফ (আ.)-এর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং বলে : “তারা বলল, আল্লাহর শপথ! আল্লাহ নিশ্চয়ই তোমাকে আমাদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন এবং আমরাতো অপরাধী ছিলাম।” (সূরা ইউসুফ, আয়াত ৯১)

হ্যরত ইউসুফ (আ.) এ বলে তাঁদের ক্ষমা করে দিলেন যে, “আজ তোমাদের বিবুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু।” (সূরা ইউসুফ, আয়াত ৯২)

পরবর্তী সময়ে ভাইয়েরা তাঁদের বৃদ্ধি পিতাকে সাথে নিয়ে হ্যরত ইউসুফ (আ.)-এর নিকট আগমন করেন। তিনি তাঁদেরকে উষ্ণ সংবর্ধনা জানান। এরপর তাঁরা সকলে একসাথে মিলেমিশে বসবাস করতে থাকেন। হ্যরত ইউসুফ (আ.) ১১০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। আমরা হ্যরত ইউসুফ(আ.)-এর মতো বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করব। তার মতো চারিত্রিক গুণাবলি অর্জন করব এবং ক্ষমা করতে শিখব।

দলীয় কাজ : শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে হ্যরত ইউসুফ (আ.)-এর জীবনী সংক্ষেপে আলোচনা করবে।

পাঠ ৩

হ্যরত মুহাম্মদ (স.)-এর জীবনাদর্শ

হ্যরত মুহাম্মদ (স.) নবৃত্ত প্রাপ্তির পর মক্কা নগরীতে ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করেন। মক্কার পরিবেশ দাওয়াতের অনুকূল না থাকায় তিনি আল্লাহর নির্দেশে মক্কা হতে মদিনায় হিজরত করেন।

হিজরত ও দেশপ্রেম

হিজরত অর্থ ত্যাগ করা, ছিন্ন করা। ইসলামি পরিভাষায় আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ বা ধর্মের নিরাপত্তার জন্য বাসভূমি ত্যাগ করে অন্যত্র গমন করা। সত্য ও ন্যায়ের জন্য স্বদেশ পরিত্যাগ করে আশ্রয় গ্রহণের উদ্দেশ্যে অন্য কোনো দেশে গমন করাই হিজরত। হিজরতের আর একটি অর্থ রয়েছে শরিয়তের নিষিদ্ধ কাজ ত্যাগ করা। মক্কা নগরীতে ইসলামের কাজ যখন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকল, তখন হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে হত্যা করার জন্য মক্কার কাফিররা সিদ্ধান্ত নিল। সে অনুযায়ী তারা এক রাতে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ঘর অবরোধ করল। আল্লাহ তায়ালা মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে কাফিরদের এ সিদ্ধান্তের ও অবরোধের কথা জানিয়ে দিলেন। হযরত মুহাম্মদ (স.) তাঁর কাছে রাখা আমানতের সম্পদগুলো হযরত আলি (রা.)-কে বুঝিয়ে দিলেন এবং স্বীয় বিছানায় তাঁকে রেখে হযরত আবু বকর (রা.)-কে সঙ্গে করে প্রত্যুষে কাফিরদের চোখ এড়িয়ে মদিনার দিকে রওয়ানা হলেন। কাফিররা ঘরে প্রবেশ করে মহানবি (স.)-এর বিছানায় হযরত আলি (রা.)-কে দেখে ভীষণ রাগান্বিত হলো। তবে তারা হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর আমানতদারী দেখে লজ্জিত হলো। যাকে শক্ত ভেবে হত্যার জন্য তাদের এ প্রচেষ্টা, তিনি এত মহান ও উদার হতে পারেন তা তারা চিন্তাও করেনি। মহানবি (স.) আবু বকর (রা.)-কে নিয়ে সাওর পর্বতের গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করলেন। এদিকে কাফিররাও তাঁদের খুঁজতে গুহার মুখ পর্যন্ত এসে পড়ল। আবু বকর (রা.) এ অবস্থা দেখে খুব বিচলিত হলেন। তখন হযরত মুহাম্মদ (স.) তাঁকে বললেন, “তুমি চিন্তা করো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।” (সূরা-আত তাওবা, আয়াত ৪০) পরিশেষে হযরত মুহাম্মদ (স.) ৬২২ খ্রিষ্টাব্দের ২৪শে সেপ্টেম্বর মদিনায় পৌছলেন। মদিনার সর্বস্তরের লোক তাঁকে সাদরে গ্রহণ করল।

মক্কায় কাফিররা যতই নির্যাতন করল, হযরত মুহাম্মদ (স.) তাদের সব নির্যাতন সহ্য করলেন। তিনি তাঁর সাথীদের বিভিন্ন দেশে হিজরত করালেও প্রিয় জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করে নিজে কোথাও যাননি। অবশেষে আল্লাহর পক্ষ থেকে হিজরতের আদেশ আসল। হযরত মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর আদেশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেন এবং জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করে মদিনায় চলে গেলেন। তিনি জন্মভূমি ছেড়ে যাওয়ার সময় মক্কাকে লক্ষ্য করে বললেন ‘আল্লাহর কসম! তুমি আল্লাহর সর্বোত্তম ভূখণ্ড এবং আল্লাহর দৃষ্টিতে সর্বাপেক্ষা প্রিয়ভূমি। আমাকে এখান থেকে জোরপূর্বক তাড়িয়ে দেওয়া না হলে আমি কখনো তোমাকে ছেড়ে যেতাম না।’ (তিরমিয়ি)

মদিনা সনদ

হিজরতের পর হযরত মুহাম্মদ (স.) মদিনায় একটি আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কতগুলো উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এগুলোর মধ্যে মদিনার সনদ উল্লেখযোগ্য। এতে তিনি ধর্ম, বর্ণ ও গোত্রীয় বিভেদ নিরসন করে পারস্পরিক শান্তি-সম্পৌত্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে কতিপয় নীতিমালা তৈরি করেন। যা মদিনা সনদ নামে খ্যাত। এটি পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান।

মদিনা সনদের ধারাসমূহ

সনদে মোট ৪৭টি (মতান্তরে ৫০টি) ধারা ছিল। নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ধারা উল্লেখ করা হলো-

২. সনদে স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায়সমূহের কারো উপর যদি বাইরের শক্তি আক্রমণ করে তবে সকল সম্প্রদায় মিলে শক্তিকে প্রতিহত করতে হবে।
৩. কেউ মদিনাবাসীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে কুরাইশদের কোনোরূপ সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারবে না কিংবা তাদের সাথে কোনোরূপ গোপন চুক্তিও করতে পারবে না।
৪. সকল সম্প্রদায় স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে। কেউ কারো ধর্ম পালনে বাধা সৃষ্টি করবে না।
৫. কেউ যদি কোনোরূপ অপরাধ করে, তবে তার জন্য তাকেই ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করা হবে। এজন্য তার সম্প্রদায়কে দোষারোপ করা যাবে না।
৬. অসহায়, দুর্বল, অত্যাচারিতকে সর্বতোভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করতে হবে।
৭. হত্যা, রক্তারক্তি ইত্যাদি কাজকর্ম এখন থেকে নিষিদ্ধ করা হলো।
৮. মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) মদিনা রাষ্ট্রের প্রধান হবেন এবং তিনিই পদাধিকার বলে প্রধান বিচারপতি হিসেবে অধিষ্ঠিত থাকবেন।

মদিনা সনদের গুরুত্ব

ইসলামের ইতিহাসে মদিনা সনদের গুরুত্ব অপরিসীম। এ সনদের ফলে মদিনার লোকজনের মাঝে সকল হিংসা-বিদ্বেষ ও কলহের অবসান হলো। তারা ঐক্যবন্ধ হলো। ধর্ম, বর্ণ ও গোত্র নির্বিশেষে সকলের প্রাপ্য অধিকার প্রতিষ্ঠা হলো। মুসলিম ও অমুসলিমদের মাঝে এক উদার সম্পৌতি স্থাপিত হলো।

হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ক্ষমতাবৃদ্ধি, বৃদ্ধিমত্তার পরিচয়সহ ইসলাম প্রসারের কাজ আরও বেগবান হলো। নাগরিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি গড়ে উঠল রাজনৈতিক ঐক্য এবং গোড়াপত্তন হলো একটি শান্তিময় ইসলামি রাষ্ট্রের।

মদিনায় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও সুশাসন

মদিনা সনদের ফলে মুসলমানরাই সবচেয়ে বেশি লাভবান হলো। মদিনায় প্রতিষ্ঠিত হলো একটি স্বাধীন, সার্বভৌম ইসলামি রাষ্ট্র। ফলে মুসলমানগণ বিনা বাধায় সকল ইসলামি বিধি-বিধান পালন করার সুযোগ পেল।

হযরত মুহাম্মদ (স.) মদিনায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা করলেন। তাঁর সুশাসনের উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপগুলো হলো-

- ক. আইনের কর্তৃত এবং সার্বভৌমত একমাত্র আল্লাহর এ বিষয়টি প্রতিষ্ঠা করা।
- খ. ধর্ম, বর্ণ গোত্রভেদে সকল নাগরিকের প্রতি সুবিচার করা।
- গ. মুসলমানদের মধ্যে সাম্য ও ভাতৃত প্রতিষ্ঠা করা।
- ঘ. সরকারের দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।
- ঙ. মজলিসে শুরা বা পরামর্শ পরিষদ গঠন করা।
- চ. ভালো কাজে একে অন্যকে সহযোগিতা করা ও অন্যায় কাজ হতে বিরত রাখা ইত্যাদি।

উপরোক্তিথিত পদক্ষেপগুলোর মাধ্যমে মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলো।

হুদায়বিয়ার সম্মিলন ও হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর দূরদর্শিতা

জন্মভূমিকে দেখার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও আল্লাহর ঘর যিয়ারত করার অদম্য ইচ্ছা হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর মনে জাগ্রত হলো। অবশেষে ৬ষ্ঠ হিজরি মোতাবেক ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দের যিলকদ মাসে তিনি মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। তাঁর সাথে ছিল ১৪০০ (চৌদশত) নিরস্ত্র সাহাবি। তাঁদের কোনো সামরিক উদ্দেশ্য ছিল না। প্রত্যেকের সাথে ছিল মাত্র একটি করে কোষবদ্ধ তরবারি। তৎকালীন আরবে প্রত্যেক লোকের সাথেই এসব থাকত। হযরত মুহাম্মদ (স.) তাঁর সাথীদের নিয়ে মক্কার ৯ মাইল দূরে হুদায়বিয়া নামক স্থানে পৌছেন। মক্কার কাফিররা মুসলমানদের আগমনের সংবাদ শুনে খুব ভীতসন্ত্রস্ত হলো। তারা মুসলমানদের প্রতিরোধ করার জন্য সদল বলে অস্ত্রসহ অগ্নিসর হলো। হযরত মুহাম্মদ (স.) মুসলমানদের পক্ষ হতে তাঁদের নিকট হযরত উসমানকে দৃত হিসেবে পাঠালেন। কাফিরদেরকে বোঝানো হলো যে মুসলমানরা শুধু হজ করে আবার চলে যাবে। হযরত উসমান (রা.) আসতে দেরি হওয়ায় মুসলমানদের মাঝে গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে হযরত উসমান (রা.)-কে হত্যা করা হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (স.) সাহাবিদের নিয়ে একটি গাছের নিচে সমবেত হলেন এবং উসমান হত্যার বদলা নেওয়ার জন্য শপথ নিলেন। এ শপথ ‘বাইয়াতে রিদওয়ান’ নামে পরিচিত। মুসলমানদের কঠিন সিদ্ধান্তের কথা জানতে পেরে কাফিররা হযরত উসমানকে মৃত্তি দিল। অনেক বাকবিতড়ার পর মুসলমান ও কাফিরদের মাঝে চুক্তি হলো। এ চুক্তি ‘হুদায়বিয়ার সম্মিলন’ নামে পরিচিত। এ চুক্তির লেখক ছিলেন হযরত আলি (রা.)। চুক্তিতে অনেকগুলো শর্ত ছিল তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো-

১. ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে মুসলমানগণ হজ সমাপন না করেই মদিনায় প্রত্যাবর্তন করবে।
২. কুরাইশ ও মুসলমানদের মধ্যে আগামী দশ বছর যেকোনো প্রকার যুদ্ধবিগ্রহ ব্রহ্ম থাকবে।
৩. আগামী বছর মুসলমানগণ হজ করতে পারবে। কিন্তু তিন দিনের অধিক সময় মক্কায় অবস্থান করতে পারবে না। সেই তিন দিন কুরাইশগণ নগর পরিত্যাগ করে অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ করবে।
৪. হজে আগমনকালে মুসলমানগণ আত্মরক্ষার জন্য কেবল কোষবদ্ধ তরবারি ছাড়া অন্য কোনো অস্ত্র সঙ্গে আনতে পারবে না।
৫. হজের সময় মুসলমানদের জানমাল নিরাপদ থাকবে।
৬. মক্কার বণিকগণ মদিনার পথ দিয়ে সম্পূর্ণ নিরাপদে সিরিয়া, ইরাক, মিসর প্রভৃতি দেশের সঙ্গে ব্যবসায়-বাণিজ্য করতে পারবে।
৭. সম্মিলন শর্তাবলি উভয় পক্ষকে পুরোপুরিভাবে পালন করতে হবে।

সম্মিলন চুক্তিগুলো বাহ্যিকভাবে মুসলমানদের বিপক্ষে মনে হলো। তবে বাস্তবে সব শর্তই মুসলমানদের অনুকূলে ছিল। সম্মিলন ফলে পরবর্তীতে বিনা বাধায় মক্কা বিজয়সহ মুসলমানদের অনেক অগ্রগতি হয়েছিল। ফলশ্রূতিতে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর দূরদর্শিতা, বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় ফুটে উঠল।

বর্তমান মুসলিম জাতির উচিত মদিনা সনদ ও হুদায়বিয়ার সম্মিলন হতে শিক্ষা গ্রহণ করা। এর ফলে মুসলিম বিশ্বে শান্তি ও সম্প্রীতি বিরাজ করবে।

দলীয় কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে বসে আলোচনা করে মদিনা সন্দের আটটি ধারার একটি তালিকা তৈরি করে পোস্টারে লিখবে।

বাড়ির কাজ : শিক্ষার্থীরা হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্তগুলোর একটি তালিকা তৈরি করে পোস্টারে লিখবে।

পাঠ ৪

হ্যরত উসমান (রা.)

পরিচয়

হ্যরত উসমান (রা.) ৫৭৩ খ্রিষ্টাব্দে মক্কার কুরাইশ বংশের উমাইয়া গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আফফান, মাতার নাম ছিল ওরওয়াহ। ইসলামের চার খলিফার মধ্যে তিনি ছিলেন তৃতীয় খলিফা। বাল্যকাল থেকেই তিনি নম্র, তদু, লজ্জাশীল ও বিনয়ী ছিলেন। তাঁর চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে রাসূল (স.) তাঁর প্রথম কন্যা বুকাইয়াকে তাঁর নিকট বিবাহ দেন। বুকাইয়া মারা গেলে অতঃপর উম্মে কুলসুমকে তাঁর কাছে বিবাহ দেন। ফলে তাঁকে ‘যুন্নুবাইন’ (দুই নুরের অধিকারী) বলা হতো। তিনি ব্যবসা করতেন বিধায় তাঁর অনেক সম্পদ ছিল। তাই তাঁকে ‘গণি’(ধনী) বলা হতো। ইসলাম ধর্ম প্রচলনের কারণে তাঁর চাচা হাকাম তাঁকে অনেক নির্যাতন করে। তাঁর নিকটাত্ত্বারাও নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দিলে তিনি তাঁর স্ত্রী বুকাইয়াসহ আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন।

ইসলামের সেবা

হ্যরত উসমান (রা.) ইসলাম প্রচলনের পর সর্বদা ইসলাম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি সর্বদা রাসূল (স.)-এর সাথে থাকতেন। এ কাজে তিনি তার সম্পদ উদার হস্তে ব্যয় করেন। তিনি নিজ খরচে মসজিদে নববি সম্প্রসারণ করেন। মদিনায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে দুস্থদের মাঝে খাদ্য বিতরণ করেন। তাবুক যুদ্ধে তিনি দশ হাজার দিনার (মুদ্রা) ও এক হাজার উষ্ণ মুসলিম সেনাবাহিনীকে দান করেন।

খিলাফত লাভ ও কুরআন সংকলন

হ্যরত উসমান (রা.) ৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা নির্বাচিত হলেন। অতঃপর তিনি রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদনের পাশাপাশি পবিত্র কুরআন সংকলনে হাত দেন। মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তৃত হলে বিভিন্ন এলাকার লোকজন পবিত্র কুরআন বিভিন্নভাবে তিলাওয়াত করতে লাগল। ফলে মুসলমানদের মধ্যে অনেক্য দেখা দিল। তিনি এ ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার গুরুত্ব উপলব্ধি করলেন। রাষ্ট্রীয় নির্দেশ জারি করে তখনকার সময়ে বিদ্যমান পবিত্র কুরআনের সকল কপি সংগ্রহ করলেন। হ্যরত হাফসা (রা.)-এর নিকট সংরক্ষিত পবিত্র কুরআনের মূল কপিটি সংগ্রহ করার মাধ্যমে কুরআন সংকলনের কাজ সমাপ্ত করেন। অতঃপর মুসলিম জাহানের গভর্নরদের নিকট একটি করে কপি পাঠান। অবশিষ্ট সংগৃহীত কপিগুলো আগুনে পুড়িয়ে দিলেন। পবিত্র কুরআনকে মূল ভাষা অনুযায়ী সংকলন করার ফলে তাঁকে ‘জামেউল কুরআন’ (কুরআন সংকলক) বলা হয়। হ্যরত উসমান (রা.) দীর্ঘ ১২ বছর খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। অবশেষে ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দে ৮৩ বছর বয়সে কতিপয় বিদ্রোহীর হাতে শাহাদতবরণ করেন। তাঁর ব্যাপারে রাসূল (স.) বলেছেন- ‘প্রত্যেক নবিরই একজন বন্ধু রয়েছে, জান্মাতে আমার বন্ধু হবেন উসমান।’

হ্যরত উসমানের রাষ্ট্র পরিচালনা

হ্যরত উসমান (রা.) ৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত খিলাফতে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর আমলে ইসলামী খিলাফত ব্যাপক বিস্তৃত হয়। পশ্চিমে মরক্কো, পূর্বে বর্তমান পাকিস্তানের দক্ষিণ-পূর্ব এবং উত্তরে আর্মেনিয়া ও আজারবাইজান পর্যন্ত তা বিস্তার লাভ করে। তাঁর সময়ে সর্বপ্রথম মুসলিম নৌবাহিনী প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রশাসনিক বিভাগসমূহ সম্প্রসারিত হয় এবং কল্যাণমূলক বহু কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়।

তিনি অনেকগুলো অর্থনৈতিক সংস্কার সম্পাদন করেন, যাতে করে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকল নাগরিকের অর্থনৈতিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়। তিনি হ্যরত ওমর (রা.) কর্তৃক প্রবর্তিত ভাতা প্রায় ২৫ ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি করেন। তাঁর সময়ে ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি সাধিত হয়। তিনি রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেন, বাজার পরিদর্শক কর্মকর্তা নিয়োগ করেন, কৃষি উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রদেশে প্রশাসক নিয়োগ করেন।

খলিফা হিসেবে রাষ্ট্রীয় কোষাগার হতে তিনি নিজের জন্য কোনো বেতন-ভাতা গ্রহণ করতেন না। তাঁর প্রথম ও বছরের শাসন আমল শান্তিপূর্ণ ছিল এবং খুলাফায়ে রাশেদিনের মধ্যে তিনি সর্বাধিক জনপ্রিয় ছিলেন।

দলীয় কাজ : শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকে হ্যরত উসমান সম্পর্কে লেখাটি পাঠ করে শ্রেণিতে দলগতভাবে আলোচনা করবে।

বাড়ির কাজ : ইসলামের কল্যাণে হ্যরত উসমান (রা.)-এর অবদানসমূহ উল্লেখ কর।

পাঠ ৫

হ্যরত আলি (রা.)

পরিচয়

হ্যরত আলি (রা.) ছিলেন রাসুল (স.)-এর চাচাতো ভাই। তিনি ৬০০ খ্রিষ্টাব্দে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আবু তালিব, মাতার নাম ফাতিমা বিনতে আসাদ। তিনি ছোটদের মধ্যে প্রথম মুসলমান। তিনি ১০ বছর বয়সে মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ‘আশাৱা-ই-মুবাশ্শাৱা’ (জান্মাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহবি)-এর একজন এবং ইসলামের চতুর্থ খলিফা। ছোটকাল থেকেই জ্ঞানের প্রতি ছিল তাঁর প্রবল আগ্রহ। তাই তিনি সর্বদা রাসুল (স.)-এর সাথে সাথে থাকতেন। রাসুল (স.)-এর প্রতি তাঁর ভক্তি ও শুদ্ধি ছিল অসীম। রাসুল (স.) তাঁকে খুব ভালোবাসতেন। তিনি তাঁর অতি আদরের কন্যা ফাতিমাকে হ্যরত আলি (রা.)-এর সাথে বিবাহ দেন। হ্যরত আলি (রা.) খুব নির্ভিক ও সাহসী ছিলেন। রাসুল (স.) হিজরতের সময় তাঁকে তাঁর বিছানায় রেখে যান। রাসুল (স.)-এর কাছে আমানত রাখা সম্পদ মূল মালিকের কাছে ফেরত দেওয়ার দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হয়। এতে তাঁর জীবনের ঝুঁকি বেড়ে যায়। এরপরও তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন।

বীরত্ব ও জ্ঞানসাধনা

হ্যরত আলি (রা.) ছিলেন একজন অসাধারণ বীরযোদ্ধা। তাঁর বীরত্বের কারণে বদরের যুদ্ধে ‘জুলফিকার’ নামক তরবারি উপহার পান। আর খায়বার যুদ্ধে ‘কামুস’ দুর্গ বিজয়ের পর রাসুল (স.) তাঁকে ‘আসাদুল্লাহ’ (আল্লাহর সিংহ) উপাধি দেন। তিনি হুদায়বিয়ার সন্ধির লেখক ছিলেন এবং মক্কা বিজয়ের সময় মুসলিম বাহিনীর পতাকা বহনকারী ছিলেন।

ফর্মা নং-১৫(ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা, ৭ম শ্রেণি)

জ্ঞান সাধক হয়রত আলি (রা.) ছিলেন জ্ঞানপিপাসুদের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। নানা প্রতিকূলতার মাঝেও তাঁর জ্ঞানচর্চা অব্যাহত ছিল। কুরআনের তাফসির, হাদিসের বিশ্লেষণ এবং আরবি ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। আরবি ভাষার ব্যাকরণ রচনায় তাঁর প্রধান ভূমিকা ছিল। তাঁর জ্ঞানের ব্যাপারে মহানবি (স.) বলেছেন, “আমি জ্ঞানের শহর, আর আলি (রা.) তার দরজা।” (মুস্তাদরাক হাকিম)। হয়রত আলি (রা.)-এর রচিত ‘দেওয়ানে আলি’ (আলির কাব্য সংকলন) আরবি সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। তিনি তাঁর শাসনামলে মসজিদে জ্ঞানচর্চার ব্যবস্থা করেন।

খলিফা নির্বাচন

৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দে হয়রত উসমান (রা.) শাহাদতবরণ করেন। এরপর মুসলমানদের মতামতের ভিত্তিতে হয়রত আলি (রা.) মুসলিম জাহানের চতুর্থ খলিফা নির্বাচিত হন। খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি অনেক সমস্যার মুখোমুখি হন। অসাধারণ মেধা ও যোগ্যতা দিয়ে দৃঢ়তার সাথে এগুলো সমাধা করেন।

হয়রত আলি (রা.)-এর রাষ্ট্র পরিচালনা

তখন মুসলমানগণ চরম উপদলীয় কোন্দলে লিঙ্গ হওয়ায় ইসলামের ইতিহাসের চরম সংকটকাল চলছিল। তিনি শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়া আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি রাজনৈতিক জোট (Coalition) গঠন করেন এবং প্রশাসনে নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি (Nepotism) সম্পূর্ণভাবে পরিহার করেন। তিনি অভিজাত ভূমি মালিকদের নিকট থেকে ভূমি পুনরঢার করেন এবং আদায়কৃত কর ও যুদ্ধলক্ষ্য সম্পদ মুসলিম নাগরিকগণের মধ্যে সমভাবে বণ্টনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। যেহেতু তখন প্রায় সকল মুসলমানই বেদুঈন ও কৃষক ছিলেন সে কারণে তিনি ভূমি ও কৃষি উন্নয়নের বিষয়ে বেশি আগ্রহী ছিলেন।

হয়রত আলি (রা.)-এর প্রশাসনিক আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে মিসরের গভর্নর মালিক আল-আশতারের কাছে প্রেরিত নির্দেশনামূলক একটি চিঠিতে, তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন, “তুমি তোমার প্রজাদের জন্য তোমার অন্তকরণে ক্ষমা, ভালবাসা ও দয়া প্রবিষ্ট কর। তাদেরকে সহজে শিকারযোগ্য মনে করে তাদের সম্মুখে পেটুক জৰুর মতো হয়ো না। কেননা তারা দুইধরনের : হয়তো তারা তোমার ধর্মীয় ভাই নয়তো তারা সৃষ্টিগতভাবে তোমার সমান। তারা অসতর্কভাবে ভুল করতে পারে, তাদের অদক্ষতা থাকতে পারে, তাদের দ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা ভুলবশত (মন্দকাজ) সংঘটিত হতে পারে। সুতরাং তাদেরকে সেভাবেই ক্ষমা কর যেভাবে তুমি আল্লাহর কাছে তাঁর ক্ষমা প্রত্যাশা কর। কেননা, তুমি তাদের উপরে এবং যে তোমাকে নিযুক্ত করেছে সে তোমার উপরে, আর আল্লাহ তার উপরে যে তোমাকে নিযুক্ত করেছে।

তুমি তাদের (প্রজাদের) চাহিদাগুলো পূরণ করবে আল্লাহ তাই প্রত্যাশা করেন এবং তিনি তাদের দ্বারা তোমাকে পরীক্ষা করছেন।”

উল্লেখ্য যে, উপর্যুক্ত নির্দেশনাকে ইতিহাসে ইসলামি শাসনের আদর্শ সংবিধান (Ideal Constitution of Islamic Governance) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

জীবনযাপন

হয়রত আলি (রা.) ছিলেন সহজ-সরল ও আত্মত্যাগের সুমহান আদর্শ। ছোটকাল থেকেই তিনি অত্যন্ত সাদাসিধে জীবনযাপন করতেন। নিজের খাদ্য নিজেই যোগাড় করতেন। কখনো কখনো অনাহারে থাকতেন।

তিনি নিজের কাজ নিজেই করতেন। জীর্ণ কুঠিতে বসবাস করতেন। ধনী-দরিদ্র সকলের সাথে মিলেমিশে চলতেন। খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পরও এসব গুণবলি তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

তিনি প্রায় ৬ বছর খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। অবশেষে ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে ইবনে মুলজাম নামক এক পথভ্রষ্ট খারেজির হাতে শাহাদতবরণ করেন। তখন তিনি নামাযরত অবস্থায় ছিলেন। রাসূল (স.) তাঁর ব্যাপারে বলেছেন- ‘সে [আলি (রা.)] প্রত্যেক মুমিনের বন্ধু।’ (তিরমিয়ি)

বাড়ির কাজ : শিক্ষার্থীরা জ্ঞানসাধনায় হ্যরত আলি (রা.)-এর অবদান সম্পর্কে
১০টি বাকেয়ের একটি অনুচ্ছেদ তৈরি করবে।

পাঠ ৬

হ্যরত ফাতিমা (রা.)

পরিচয়

হ্যরত ফাতিমা ছিলেন হ্যরত মুহাম্মদ (স.)-এর কনিষ্ঠ কন্যা। তাঁর মাতা ছিলেন হ্যরত খাদিজাতুল কুবরা (রা.)। তিনি নবৃত্যতের ৫ বছর পূর্বে ৬০৫ খ্রিষ্টাব্দে মুক্তি নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবকাল থেকে তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্না ও সৎ চরিত্রের অধিকারিণী।

তিনি যাহরা (অনিন্দ্য সুন্দরী, পরমা লাবন্যময়ী) ও বাতুল (পবিত্র সংসারে অনাসন্ত) উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। বদরের যুদ্ধের পর হিজরি দ্বিতীয় সনে হ্যরত আলি ইবনে আবু তালিবের সাথে তাঁর বিবাহ হয়। বিবাহের দেন মোহর ছিল ৪৮০ - ৫০০ দিরহাম (মুদ্রা)।

সরল জীবনযাপন

হ্যরত ফাতিমা (রা.) খুব সহজ-সরল জীবনযাপন করতেন। তাঁর স্বামী হ্যরত আলি (রা.) দরিদ্র হলেও তাঁর কোনো দুঃখ ছিল না। হ্যরত আলি (রা.) পরিশুম করে যা অর্জন করতেন তা দিয়ে তিনি সংসার চালাতেন। কখনো কখনো অনাহারে-অর্ধাহারে তাঁর দিন অতিবাহিত হতো। তিনি ত্যাগ স্বীকার করতেন কিন্তু কখনো ধৈর্য হারাতেন না। এমনকি তাঁর চেহারায়ও কফ্টের কোনো ছাপ দেখা যেত না। তিনি নিজ হাতে সংসারের সকল কাজ করতেন। তাঁর কোনো চাকরানী ছিল না। জাঁতা পিষা ও বালতি দিয়ে পানি উঠানোর ফলে তার হাতে ফোস্কা পড়ে যেত। তিনি সবসময় সাজসজ্জা ও জাঁকজমক পোশাক পরিহার করে চলতেন।

দানশীলতা

হ্যরত ফাতিমা (রা.) দানের ব্যাপারে ছিলেন খুবই উদার। দান করার সময় তিনি যে অভাবী তা বোঝা যেত না। খালি হাতে কেউ তাঁর নিকট থেকে ফেরত যেত না। বর্ণিত আছে, একদা তিনি খাবারের লোকমা

মুখে তুলছিলেন, এমন সময় একজন ভিক্ষুক এসে বলল, ‘হে নবি কন্যা! আমাকে ভিক্ষা দিন। গত তিন দিন যাবৎ আমি অনাহারে আছি।’ তিনি তাঁর খাবারটুকু ভিক্ষুককে দিতে পুত্র হাসানকে নির্দেশ দিলেন। এতে হাসান (রা.) আপত্তি জানিয়ে বললেন, আমা! গতকাল হতে আপনি কিছুই খাননি। আপনি এ খাবার খেয়ে নিন। উত্তরে তিনি পুত্র হাসানকে বললেন, ‘এটা ভুল হবে। আমি মাত্র একদিন অভ্যন্তর আছি, আর এ ফকির তিন দিন ধরে কোনো কিছু খায়নি।’

পিতৃভক্তি

ছেটবেলা হতে হ্যরত ফাতিমা (রা.) তাঁর পিতার প্রতি অনুরাগী ছিলেন। হ্যরত মুহাম্মদ (স.)-এর ইন্তিকালের পূর্বে তিনি হ্যরত ফাতিমা (রা.)-কে ডাকলেন, কানে কানে কী যেন বললেন, সাথে সাথে হ্যরত ফাতিমা (রা.) কান্নায় ভেঙে পড়লেন। পুনরায় মহানবি (স.) তাঁকে কাছে ডেকে কী যেন বললেন, তাতে তিনি হাসতে লাগলেন। হ্যরত আয়েশা (রা.) তাঁকে হাসি-কান্নার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আবাজান প্রথমে আমাকে জানিয়েছেন ‘মা আমার আর সময় নেই, আমি তোমাদের ছেড়ে চলে যাব’। আর দ্বিতীয়বার আমাকে জানিয়েছেন, ‘পরিবারের সকলের মধ্যে আমিই তাঁর [মুহাম্মদ (স.)] সাথে প্রথমে মিলিত হবো।’ হ্যরত মুহাম্মদ (স.)-এর ইন্তিকালের পর তাঁর জীবনে শোকের ছায়া নেমে আসে। এরপর তিনি যত দিন বেঁচে ছিলেন কখনো মুচকি হাসি হাসেননি।

স্বভাব চরিত্র

হ্যরত ফাতিমা (রা.) হ্যরত মুহাম্মদ (স.)-এর সকল গুণই অর্জন করেছিলেন। তিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠ, লজ্জাশীল, পরোপকারিণী, ধৈর্যশীল ও আল্লাহর উপর অধিক আস্থাশীল। হ্যরত মুহাম্মদ (স.) বলেন, ‘ফাতিমা আমার দেহের এক অংশ, যে তাঁকে নারাজ করবে, সে আমাকে নারাজ করবে।’ (সহিহ বুখারি)

তিনি আরও বলেন, ‘ফাতিমা হলেন জান্নাতবাসী মহিলাদের নেতৃ।’ (সহিহ বুখারি)। হ্যরত আয়েশা (রা.) বলেন, ‘আমি ফাতিমার তুলনায় স্পষ্টভাষ্য ও সত্যবাদী কাউকে দেখিনি। তবে তাঁর পিতার কথা স্বতন্ত্র।’ (আল-ইস্তি’য়াব)

সন্তান-সন্ততি

হ্যরত ফাতিমা (রা.)-এর গর্ভে ৫ জন সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা হলেন হ্যরত হাসান (রা.), হ্যরত হোসাইন (রা.), হ্যরত মুহসিন (রা.), হ্যরত উম্মে কুলসুম (রা.) ও হ্যরত যয়নব (রা.)। হ্যরত মুহসিন (রা.) বাল্যকালে মৃত্যুবরণ করেন।

ইন্তেকাল

হ্যরত মুহাম্মদ (স.)-এর ইন্তেকালের পর হ্যরত ফাতিমা (রা.) ছয় মাস জীবিত ছিলেন। এগারো হিজরির তৃতীয় রম্যান মজলিবার তিনি ইন্তেকাল করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ২৯ বছর। হ্যরত ফাতিমা (রা.)-কে জান্নাতুল বাকিতে দাফন করা হয়। সুন্দর চরিত্র, পিতৃভক্তি, অকৃত্রিম স্বামী সেবা, দানশীলতা ও লজ্জাশীলতা হ্যরত ফাতিমা (রা.)-কে বিশ্ব নারী জাতির ইতিহাসে মহীয়সী করে রেখেছে।

দলীয় কাজ : শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা হ্যরত ফাতিমা (রা.)-এর চারিত্রিক গুণাবলির তালিকা তৈরি করবে।

অনুশীলনী

শূন্ঘান পূরণ কর

- ১। হযরত ইসমাইল (আ.)-কে কুরবানি করার নির্দেশ ছিল একটি _____।
- ২। ইসলামের ইতিহাসে মদিনার সনদের গুরুত্ব _____।
- ৩। হযরত আলি (রা.) ছিলেন একজন _____ বীর যোদ্ধা।
- ৪। হযরত ফাতিমা (রা.) _____ ব্যাপারে ছিলেন খুবই উদার।

বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর

বাম পাশ	ডান পাশ
১. হযরত ইসমাইল (আ.)	সর্বোত্তম কাহিনী।
২. হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাহিনী	আল্লাহর নবি ও রাসুল।
৩. হযরত মুহাম্মদ (স.)	একটি শান্তি চৃক্ষি।
৪. মদিনার সনদ	আল্লাহর নবি।
৫. তুদায়বিয়ার সম্মিলন	পৃথিবীর সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. হযরত ইসমাইলের বৎসরপরিচয় লেখ।
২. হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর দেশপ্রেম সম্পর্কে লেখ।
৩. মদিনা সনদ কী?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. হযরত ইউসুফ (আ.)-এর জীবনী লেখ।
২. হযরত উসমান (রা.)-কে ছিলেন? ইসলামের কল্যাণে তার অবদানসমূহ লেখ।
৩. হযরত আলি (রা.)-এর বীরত্ব ও জ্ঞানসাধনার একটি বর্ণনা দাও।
৪. হযরত ফাতিমা (রা.)-এর পরিচয়, জীবনযাপন ও দানশীলতা সম্পর্কে যা জান লেখ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. হয়রত ইউসুফ (আ.)-এর সহোদর ভাইয়ের নাম কী ?
- ক. ইসমাইল (আ.)
 - খ. বিন ইয়ামিন (আ.)
 - গ. খালিদ বিন ওয়ালিদ (র)
 - ঘ. ইউনুছ (আ.)
২. হয়রত ইসমাইল (আ.)-কে কুরবানির জন্য আল্লাহর নির্দেশ ছিল -
- i. পিতা ইবরাহিম (আ.)-এর আনুগত্য পরীক্ষা
 - ii. পুত্র ইসমাইল (আ.)-এর আনুগত্য পরীক্ষা
 - iii. কুরবানি ওয়াজিব করার জন্য
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক. i
 - খ. ii
 - গ. i ও ii
 - ঘ. ii ও iii
- অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :**
- প্রবাসী জালাল মিয়া উদার হস্তে দান করেন এবং এলাকায় কয়েকটি মসজিদ নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এতে এলাকার মোড়ল তার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে একদল দুষ্ক্রিয়ালী লেলিয়ে দেয় এবং তারা তাকে অপমানিত করে। তারপরও জালাল মিয়া নিবৃত্সাহিত না হয়ে তার জনকল্যাণমূলক কাজ অব্যাহত রাখেন।
৩. জালাল মিয়ার কাজে মূলত কোন খলিফার চরিত্র ফুটে উঠেছে?
- ক. হয়রত আবু বকর (রা.)-এর
 - খ. হয়রত উমর (রা.)-এর
 - গ. হয়রত উসমান (রা.)-এর
 - ঘ. হয়রত আলি (রা.)-এর
৪. জালাল মিয়ার কাজের ফলে -
- i. আল্লাহ খুশী হন
 - ii. সমাজ উপকৃত হয়
 - iii. নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হয়
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক. i
 - খ. ii
 - গ. i ও ii
 - ঘ. ii ও iii

সূজনশীল প্রশ্ন

১। পলাশপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিচালনা পরিষদের নির্বাচনে পাশাপাশি অবস্থিত দুই গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে একটি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিবাদের সৃষ্টি হয়। বিবাদের চরম পর্যায়ে পাশুবর্তী গ্রামের সেলিম মিয়ার মধ্যস্থতায় উভয় গ্রামের কয়েকজন প্রতিনিধিকে নিয়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে একটি সমরোতা চুক্তি করা হয়। এতে উভয় গ্রামের মানুষ নিশ্চিত সংঘর্ষ থেকে মুক্তি পায়। শেষে সেলিম মিয়া সবার উদ্দেশ্যে বলেন, শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় সবার মহানবি (স.) প্রবর্তিত সনদের অনুসরণ আবশ্যিক।

ক. হিজরত শব্দের অর্থ কী?

খ. মহানবি (স.) মদিনায় হিজরত করলেন কেন?

গ. উদ্দীপকে সমরোতা চুক্তিটি মহানবি (স.)-এর কোন চুক্তির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. স্থানীয় সেলিম মিয়ার শেষ উক্তিটি দ্বারা রাসূল (স.) প্রবর্তিত যে সনদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে তার বিশ্লেষণ কর।

২. প্রাচুর্য আর ধন-সম্পদ ধনাত্য জাহিদ সাহেবকে অহংকারী করেনি, বরং তিনি খাঁটি মুমিন। মুমিন হওয়ার কারণে গ্রামের অন্যান্য লোকজন তাকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিত। তারপরও গ্রামে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিনি খাদ্য বিতরণ করে সবাইকে সাহায্য করেন। গ্রামে কুরআন তিলাওয়াতকে কেন্দ্র করে অনেক দেখা দিলে সবাইকে ঐক্যবন্ধ রাখার প্রয়াস চালান।

ক. ইসলামের তৃতীয় খলিফার নাম কী?

খ. ইসলামের তৃতীয় খলিফাকে কেন গণি বলা হতো?

গ. জাহিদ সাহেবের আচরণে তৃতীয় খলিফার যে চারিত্রিক গুণের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. গ্রামবাসীকে ঐক্যবন্ধ রাখতে জাহিদ সাহেবের প্রচেষ্টা তৃতীয় খলিফার কোন ঘটনার সাথে সম্পর্কিত-বিশ্লেষণ কর।

সমাপ্ত



অশান্তি যুদ্ধ হতেও গুরুতর – আল কুরআন

শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমেই জীবনে সাফল্য অর্জন করতে হবে
– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে
১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন



২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য